চিত্র ১০।

হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস্, রক্তবাহী ধমনী ও শিরা। (২১ পৃষ্ঠা)

১—ফুসফুস্। ২—হৃৎপিণ্ড। ৩—এওরটা নামক ধমনী।
৪—ধমনী। ৫—শিরা।

# সচিত্র স্বাস্থ্য-পাঠ।

এলাহাবাদ মিওর সেণ্ট্রাল কলেজের
রসায়ন শাস্ত্রের অন্যতম অধ্যাপক
শ্রীকুমারচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি., এল্. টী.
কর্ত্তৃক লিখিত
ও
শ্রীফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি. এ., এল. এল. বি. কর্ত্তৃক
মূল ইংরাজী হইতে অনূদিত।

---



প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ
ও
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা
১৯১৮
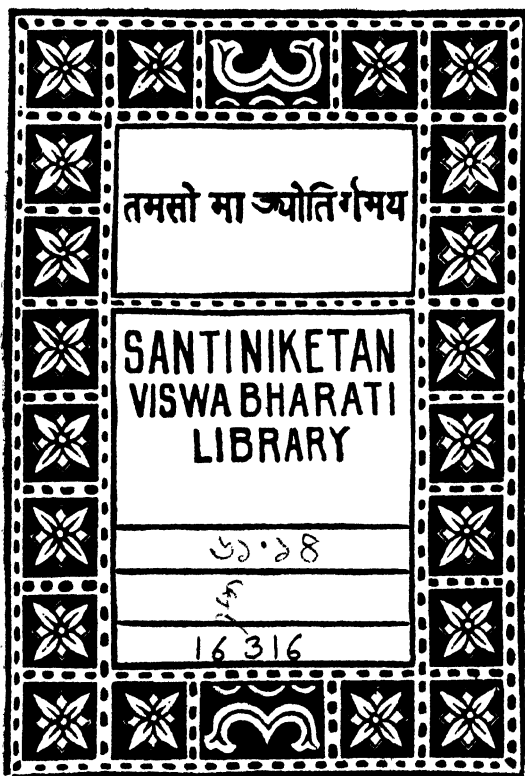


[ মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

# ভূমিকা।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশের শিক্ষাবিভাগ তত্রত্য নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রগণের পাঠোপযোগী শারীরবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পুস্তক ইংরাজী, এবং হিন্দী অথবা উর্দ্দু ভাষায় লিখিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। তদনুসারে ঐ বিষয় অবলম্বন করতঃ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক একখানি পুস্তক ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয় এবং তাহা উর্দ্দু ভাষায় অনূদিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে গ্রন্থকার-লিখিত পুস্তকগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তজ্জন্য গ্রন্থকার গবর্ণমেন্ট হইতে ৩০০৲ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।

বাঙ্গালা ভাষায় শারীরবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পুস্তকের অভাব না থাকিলেও তাহার অল্পতা আছে মনে করিয়া, মধ্য-ইংরাজী ও মধ্য-বাঙ্গালা পরীক্ষার্থিগণের শারীরবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করতঃ মূল ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত হইল।

ইংরাজী ভাষায় শারীরবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় এরূপ ভাবে লিখিত অনেক পুস্তক আছে, যাহা পাঠ করিলে সাধারণ পাঠক, রসায়নশাস্ত্রাদি না জানিলেও, শরীর ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিতে পারেন। কিন্তু এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় বিরল। সুতরাং, সেই অভাব পূরণকল্পেই এই ক্ষুদ্র উদ্যম।

পুস্তকখানি প্রধানতঃ বালকবালিকাদের জন্য লিখিত, কিন্তু অপরেও ইহা পাঠ করিলে শরীর ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন।

'স্বাস্থ্য-পাঠ' আদ্যোপান্ত সরল ভাষায় লিখিত। ইহা বুঝিবার জন্য বিজ্ঞান জানিবার প্রয়োজন নাই। যেখানে বৈজ্ঞানিক বিষয় বুঝাইবার প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানে সহজ পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এ সকল পরীক্ষা সকলেই অন্যের সাহায্যব্যতীতও অনায়াসে

করিতে পারিবেন। কঠিন বৈজ্ঞানিক শব্দ ( যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রাদিতে আছে ) কোথাও ব্যবহার করা হয় নাই; যতদূর সম্ভব প্রচলিত শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই পুস্তকে যে কতকগুলি স্বাস্থ্য-নিয়ম মাত্রই আছে তাহা নহে। বরং এই নিয়মগুলির সহিত আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির ক্রিয়ার কি সম্বন্ধ, তাহাও বুঝাইতে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইয়াছে; কারণ ঐ সকল নিয়ম-পালনের হেতু জানিতে পারিলে শারীরিক মঙ্গলার্থ তৎপালনে সকলেই যত্নবান হইবেন সন্দেহ নাই।

শারীরবিজ্ঞান অনেকের নিকট নীরস ও কঠিন বোধ হয়। এজন্য কোন স্থলে আমোদজনক বর্ণনা ও সরল উদাহরণ, কোন স্থলে বোধ-সৌকর্য্যার্থে সুরঞ্জিত চিত্র, কোথাও বা একবর্ণ চিত্র প্রভৃতি দ্বারা পাঠগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অতএব আশা করা যায় যে, এই প্রয়াসে নীরস শারীরবিজ্ঞানপাঠের বিভীষিকা অনেকাংশে বিদূরিত হইবে।

এই পুস্তকে সন্নিবেশিত চিত্রগুলি প্রস্তুত করিবার সময় গ্রন্থকার তাঁহার বন্ধু, অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ট্রেণিং কলেজের সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লালমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এজন্য তিনি তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন।

যাহাতে চিররুগ্ন ও ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত বঙ্গীয় বালকবালিকাগণ স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য ও অবশ্য পালনীয় বিষয়গুলি যথাসময়ে জ্ঞাত হইয়া কার্য্যতঃ তৎসমুদয় পালন করিয়া সুস্থ ও সবল শরীর এবং সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে, সেই মহদুদ্দেশ্য সাধনার্থেই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা তাহাদের করকমলে অর্পিত হইল।

এলাহাবাদ
১৯১৮।

শ্রীকুমারচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
শ্রীফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

# উপক্রমণিকা

কেহ তোমাদিগকে পৃথিবীর সাতটী আশ্চর্য্য বস্তুর নাম করিতে বলিলে, তোমরা নিশ্চয় তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিবে। কিন্তু এই সাতটী বস্তু ব্যতীত আরও একটী বস্তু আছে, তাহা ইহাদের সকলের অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যজনক। এই বস্তুটীর নাম বলিব? ইহা মনুষ্যের শরীর।

এই নাম শুনিয়াই তোমরা নিশ্চয় বলিয়া উঠিবে—মনুষ্যের শরীর এমন কি আশ্চর্য্য জিনিষ! কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে চীনের দেওয়াল বা মিশরের পিরামিড্ বা ব্যাবিলনের শূন্যের বাগান বা আগরার তাজমহল প্রভৃতি অপেক্ষা মনুষ্যের শরীর অধিকতর বিস্ময়জনক।

মনুষ্যের শরীর যে কিরূপ আশ্চর্য্যজনক তাহার একটু আভাস দিতেছি। তুমি ইচ্ছা করিলেই তোমার হস্ত-পদ অনায়াসে সঞ্চালিত করিতে পার। কিন্তু তোমার কর্ণদ্বয় সঞ্চালিত করিতে পার কি? তুমি ইচ্ছা করিলেও কর্ণ আপনা হইতে সঞ্চালিত হইবে না। কেন? পশুরা কিন্তু ইচ্ছা করিলেই তাহাদের কর্ণ সঞ্চালিত করিতে পারে।

আরও দেখ। তোমার বক্ষের মধ্যে হৃৎপিণ্ড সর্ব্বদা স্পন্দন করিতেছে। তুমি ইচ্ছা করিলেও ইহার স্পন্দন স্থগিত

রাখিতে পার না। কে তোমার হৃৎপিণ্ডকে সর্ব্বদা স্পন্দন করাইতেছে? কেন হৃৎপিণ্ড সর্ব্বদা স্পন্দন করিতেছে? হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের দ্বারা আমাদের কি লাভ হইতেছে? আমরা সকলেই নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু কেন নিশ্বাস গ্রহণ করি, কি প্রকারে বায়ু আমাদের বক্ষে প্রবেশ করে, তাহা তোমরা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? আহার না করিলে মনুষ্য জীবিত থাকে না। আহার্য্য-দ্রব্য শরীরে কোথায় যায়, যাইয়া কি হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান না। এই পুস্তকে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, মনুষ্যের শরীর ভগবানের কি অদ্ভুত সৃষ্টি!

এই পুস্তকখানি লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা পাঠ করিলে তোমরা শরীরমধ্যস্থ অদ্ভুত কল-কৌশলগুলি ও স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রয়োজনীয় সাধারণ নিয়মাবলী অবগত হইবে।

---

# সূচী

# সচিত্র স্বাস্থ্য-পাঠ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### নর-কঙ্কাল।

তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, শরীরের প্রায় সর্ব্বত্রই হাড় আছে। নিজের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে টিপিয়া দেখিলে, তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, কতকগুলি হাড় মাংসের ভিতরে আছে, যেমন উরুতে; এবং কতকগুলি চর্ম্মের অব্যবহিত পরেই রহিয়াছে, যেমন মাথায় ও গুল্ফ-দেশে (ankle)।

মনুষ্য-শরীরে ভিন্ন ভিন্ন আকারের দুই-শতের অধিক হাড় আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি লম্বা, কতকগুলি ছোট এবং কতকগুলি চেপ্‌টা। যেমন উরুতে লম্বা, গুল্ফদেশে ছোট এবং মাথার খুলিতে চেপ্‌টা হাড় আছে।

রবারের দড়ি যেমন টানিলে বড় হয় এবং ছাড়িয়া দিলে ছোট হইয়া যায়, সেইরূপ স্থিতিস্থাপক কতকগুলি বন্ধনীর (ligaments) দ্বারা আমাদের শরীরের সমস্ত হাড়গুলি নিজ নিজ স্থানে বাঁধা আছে। এইরূপে সংবদ্ধ অস্থিসকল আমাদের শরীরকে ধারণ করে এবং ইহাকেই **কঙ্কাল** (skeleton) বলে।

চিত্র ১—কঙ্কাল।

১—মাথার খুলি। ২—মুখ। ৩—উরুর হাড়। ৪—গুল্‌ফ।
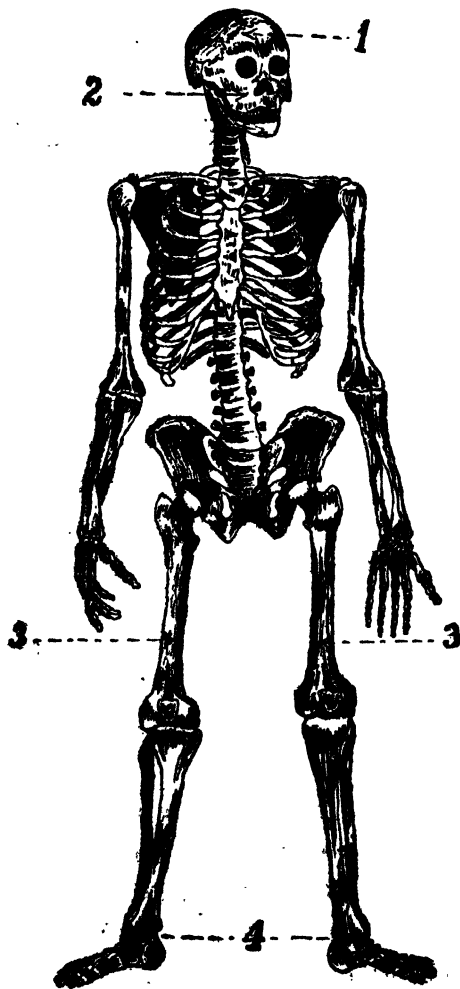
কঙ্কাল না থাকিলে আমরা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে বা চলিতে পারিতাম না। তোমরা বোধ হয় দেখিয়াছ যে, প্রতিমা গড়িবার সময় প্রথমে বাঁশ ও খড় দিয়া কাঠাম প্রস্তুত করা হয়, পরে উহার উপর মাটী দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হয়। আমাদের দেহটীও ঠিক এইভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। কঙ্কালটী যেন হাড়ের কাঠাম, ইহার উপর মাংস ও চামড়া দ্বারা আমাদের দেহটী নির্ম্মিত। কঙ্কাল মাংসে এবং চর্ম্মে আবৃত থাকে বলিয়া ইহা আমরা দেখিতে পাই না। এস, কঙ্কালের নির্ম্মাণ-প্রণালী আমরা ভাল করিয়া দেখি। প্রথম চিত্র দেখিলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, মস্তকের অস্থি, শরীরের মধ্যভাগের ( ধড়—trunk ) অস্থি, হস্তদ্বয়ের অস্থি এবং পদদ্বয়ের অস্থি, এই চারি অঙ্গের অস্থিসমূহ লইয়াই কঙ্কাল।

**মস্তক।** আমরা মস্তকটীকে প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিব। মস্তকের দুই ভাগ আছে; খুলি এবং মুখ (face)। খুলিটী গোল, ফাঁপা বাক্সের মত। ইহার মধ্যে মস্তিষ্ক থাকে। খুলিই মস্তিষ্ককে রক্ষা করিয়া আছে। ( ২য় চিত্র )। খুলিটী আটখানি চেপ্‌টা হাড় দ্বারা নির্ম্মিত। এই হাড়গুলির যোড়ের মুখ কতকটা করাতের দাঁতের মত। পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তির মাথার এই হাড়গুলি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যায়, কিন্তু শৈশবাবস্থায় এগুলি একটু পৃথক্ পৃথক্ থাকে। এই কারণে অল্পবয়স্ক শিশুর মাথায় হাত দিলে মস্তিষ্কের স্পন্দন অনুভূত হয়। এইজন্য শিশুর মাথার কোন স্থান কখনও টেপা উচিত নয়, কেননা ইহাতে শিশুর মস্তিষ্কে বিষম আঘাত লাগিতে পারে। পূর্ণ-বয়স্ক না হইলে শিশুর খুলির হাড়গুলি সম্পূর্ণরূপে সংলগ্ন হয় না; এইজন্য তাহাদের নরম মস্তিষ্কে কোন রকমে ( যথা, কাণ মলা, চড় মারা প্রভৃতি দ্বারা ) আঘাত লাগিলে বিষম বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

সামান্য আঘাত লাগিলে কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিতে না পারে, এইজন্য খুলিটী অনেকগুলি হাড় দ্বারা দৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত। বলিতে পার,

খুলি কি জন্য এত দৃঢ়? ইহার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা শরীরের অতি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত কোমল অংশকে ( মস্তিষ্ককে ) রক্ষা করে।
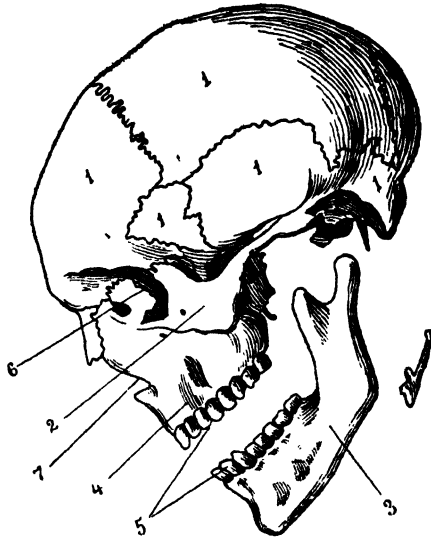
চিত্র ২—মস্তক।

১—খুলি। ২—নাসিকার হাড়। ৩—নীচের চোয়ালের হাড়। ৪—উপরের চোয়ালের হাড়। ৫—দাঁত। ৬—চক্ষুর কোটর। ৭—নাসারন্ধ্র।

খুলির নীচে, মস্তকের নিম্নভাগকে মুখ বলে। মুখে ১৪খানি ছোট ছোট হাড় আছে। তোমরা ইহার অধিকাংশ হাড়গুলি টিপিয়া দেখিলে অনুভব করিতে পারিবে। চৌদ্দখানি হাড়ের মধ্যে ৭ খানি মুখের উপরিভাগে পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু মুখের নীচের ভাগে একখানি হাড় উপরের হাড়ের সহিত এমন ভাবে সংলগ্ন আছে, যে, ইহার চালনা সহজে হইতে পারে। ইহাই নীচের চোয়ালের হাড়,

ইহার উপরেই উপরের চোয়াল। উপরের চোয়াল দুইখানি হাড় দ্বারা নির্ম্মিত; একখানি হাড় মুখের দক্ষিণ দিকে, অপরখানি বাম দিকে আছে। খাদ্য-দ্রব্য কামড়াইবার এবং চিবাইবার জন্য প্রত্যেক চোয়ালে ষোলটী করিয়া দাঁত আছে। যদি নীচের চোয়াল উপরের চোয়ালের সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকিত, তাহা হইলে আমরা কথা কহিতে বা খাদ্যাদি চর্ব্বণ করিতে পারিতাম না।

দ্বিতীয় চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে যে, খুলির এবং মুখের হাড় এমন ভাবে সাজাইয়া বসান হইয়াছে যে, মুখের দুই দিকে দুইটী গোল গর্ত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নাসিকার হাড় রহিয়াছে। এই গর্ত্ত দুইটীর মধ্যে চক্ষু থাকে; এই গর্ত্ত দুইটী চক্ষুকে রক্ষা করে। উভয় চক্ষু-গর্ত্তের মধ্যস্থলে এবং নাসিকার হাড়ের নীচে আর একটী গর্ত্ত আছে। (২য় চিত্র)। ইহাকেই নাসারন্ধ্র বলে।

দেখিলে, অস্থি আমাদের শরীরের কোমল অঙ্গগুলি কেমনভাবে রক্ষা করিতেছে! ইহার দৃষ্টান্ত পরে আরও পাইবে।

**ধড়।** ধড় মস্তককে ধারণ করিয়া আছে। (৩য় চিত্র)। মাথা, হাত দুইটী এবং পা দুইটী বাদ দিলে শরীরে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাকেই ধড় বলে।

গলা হইতে কোমর পর্য্যন্ত ধড়। ধড়ের উপরে বাহুদ্বয় এবং নীচে পদদ্বয় সংলগ্ন। **মেরুদণ্ড,** (শিরদাঁড়া) (backbone বা spine) **পঞ্জরাস্থি,** (ribs) **উরোস্থি,** (বক্ষের হাড়) (breastbone বা sternum) এবং **কোমরের হাড়** (hip-bone), এই হাড়গুলি লইয়াই ধড়।

ঘাড় হইতে কোমর পর্য্যন্ত পিঠের মাঝামাঝি যে লম্বা হাড় আছে, তাহাকে মেরুদণ্ড বলে। ইহা শরীরের স্তম্ভবিশেষ, ইহা মস্তক এবং ধড়কে ধারণ করিয়া আছে। মেরুদণ্ড একখানি হাড় নহে, কিন্তু

চিত্র ৩।

ধড়।
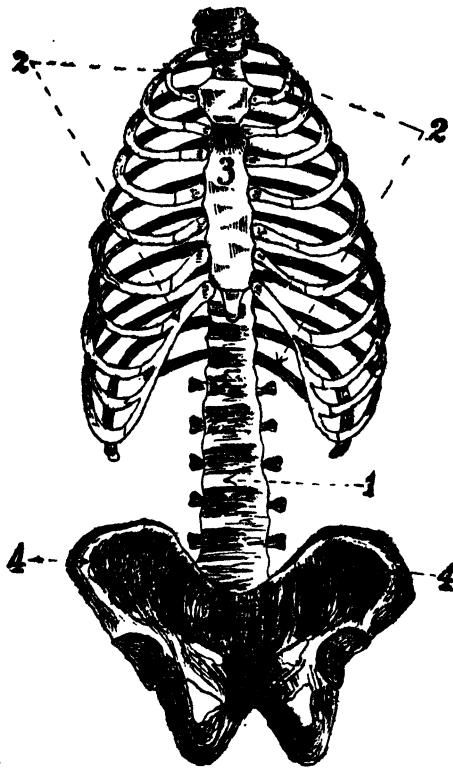
১—মেরুদণ্ড। ২—পাঁজর। ৩—উরোস্থি। ৪—কোমরের হাড়।

অনেকগুলি ছোট ছোট হাড়ের মালার মত। চতুর্থ চিত্রে একখানি মেরুদণ্ডের হাড় দেখান হইয়াছে। এইরূপ হাড়কে কশেরুকা বলে।

প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মেরুদণ্ডে এইরূপ ২৬ খানি হাড় থাকে। মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে, অর্থাৎ ঘাড়ে ৭ খানি হাড়, মধ্যভাগে ১২ খানি, এবং নিম্নভাগে

চিত্র ৪।

মেরুদণ্ডের একখানি হাড়।

৭ খানি হাড় থাকে। প্রত্যেক হাড় নীচের হাড়ের উপর ভর দিয়া আছে। প্রত্যেক দুইখানি হাড়ের মধ্যে রবারের মত শক্ত পদার্থ (cartilage) আছে, এইজন্য হাড়ে হাড়ে ঘর্ষণ হয় না। এই হাড়গুলি খুলি অথবা মুখের হাড়ের ন্যায়, একটী অপরটীর সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত নহে, কিন্তু পূর্ব্বকথিত রবারের দড়ির ন্যায় দড়ি দ্বারা বাঁধা। হাড়গুলি এইরূপ ভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত আছে বলিয়া আমরা শরীরকে কতকটা নোয়াইতে এবং এদিক্ ওদিক্ ফিরাইতে পারি। যদি মেরুদণ্ড লাঠির মত সোজা একখানি হাড় হইত, কিম্বা যদি হাড়গুলি পৃথক্ পৃথক্ না থাকিয়া, মাথার খুলি অথবা মুখের হাড়ের ন্যায় একত্র সংলগ্ন থাকিত, তাহা হইলে আমরা শরীর মোটেই বাঁকাইতে বা নীচু করিতে পারিতাম না।

এক পার্শ্ব হইতে দেখিলে মেরুদণ্ডকে যেমন দেখায়, তাহা পঞ্চম চিত্রে দেখান হইয়াছে।
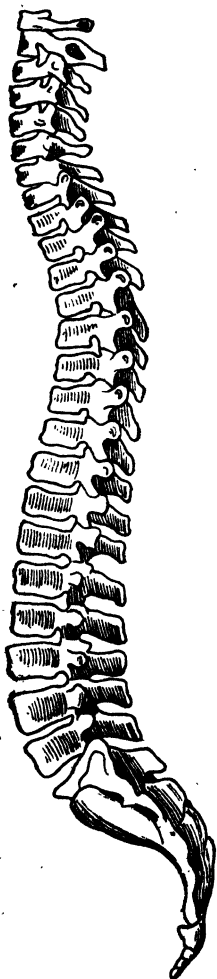
চিত্র ৫—মেরুদণ্ড।

৫ম চিত্র হইতে তুমি দেখিতে পাইবে যে, মেরুদণ্ড সোজা নয়; কিন্তু বাঁকা। ঘাড়ে বাঁকিয়া সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়াছে, পিঠে বাঁকিয়া পশ্চাতে গিয়াছে এবং কোমরের নিকট বাঁকিয়া আবার সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়াছে। মেরুদণ্ডের এই বক্রতার জন্য ধড়টি সুন্দর দেখায় এবং আমরা সম্মুখে ও পশ্চাতে কতকটা নীচু হইতে পারি।

৫ম চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে যে, মেরুদণ্ডের উপরের ভাগ হইতে নীচের ভাগের হাড়গুলি অধিক স্থূল এবং দৃঢ়। আরও দেখিবে যে, সর্ব্বাপেক্ষা নীচের যে হাড়টীর উপর মেরুদণ্ড দাঁড়াইয়া আছে, তাহা সকল হাড় অপেক্ষা স্থূল এবং দৃঢ়। বলিতে পার, মেরুদণ্ডের নীচের এই হাড়খানি কিজন্য এত স্থূল ও দৃঢ়? ইহার কারণ এই যে, এই হাড়খানিকেই শরীরের উপরের অংশের সমস্ত ভার বহন করিতে হয়।

**পঞ্জরাস্থি এবং উরোস্থি।** ধড়ের সম্মুখে গলা হইতে যে হাড়খানি সোজা নীচে নামিয়াছে তাহাকে উরোস্থি বা বক্ষের হাড় বলে। ধড়ের দুই পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিলে, কতকগুলি লম্বা লম্বা, বাঁকা বাঁকা হাড় দেখিতে পাইবে। ইহাদিগকে পাঁজর বলে। পাঁজরগুলি সব সমান নয়; কতকগুলি ছোট, কতকগুলি বড়। এক এক পার্শ্বে ১২ খানি করিয়া হাড়

আছে। ইহার প্রত্যেকটী পশ্চাতে মেরুদণ্ডের সহিত সংলগ্ন আছে এবং অধিকাংশগুলি ( সবগুলি নয় ) রবারের মত এক শাদা পদার্থ (cartilage) দ্বারা সম্মুখে বক্ষের হাড়ের সহিত সংলগ্ন আছে। তৃতীয় চিত্র হইতে তুমি দেখিতে পাইবে যে, প্রত্যেক পার্শ্বে সাতটী করিয়া কেবল চৌদ্দটী পাঁজরা সম্মুখে বক্ষের হাড়ের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে; ইহার পরের তিন তিন খানি পাঁজরা পরস্পর এবং সপ্তম পাঁজরার সহিত সংলগ্ন এবং তাহার পরের দুই দুই খানি পাঁজরা বক্ষের হাড়ের সহিত কোনই সম্বন্ধ রাখে না।

এইরূপে মেরুদণ্ড, বক্ষের হাড় এবং পাঁজরা মিলিয়া একটী গহ্বর সৃষ্টি করিয়াছে, এই গহ্বরকে বক্ষঃস্থল বা বক্ষঃ কহে। ইহার মধ্যে হৃৎপিণ্ড (heart) ও ফুস্‌ফুস্ (lungs) থাকে। বক্ষের বাম দিকে হাত দিলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করিতে পারিবে। ফুস্‌ফুস্ শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়ার যন্ত্র। এই যন্ত্রদ্বয়ের বিবরণ পরে জানিতে পারিবে।

পাঁজরার বিষয় ত দেখিলে। পাঁজরার নির্ম্মাণপ্রণালী দেখিয়া তোমার কিছু মনে হয় না? বল দেখি পাঁজরাগুলিকে ভগবান বক্ষের হাড়ের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত না করিয়া, নরম শাদা রবারের ন্যায় এক পদার্থ দ্বারা বক্ষের হাড়ের সহিত কেন সংলগ্ন করিয়া দিয়াছেন? ইহার উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্বাস লইবার সময় পাঁজরাগুলি একটু একটু উপরে সরিয়া ( পাঁজরাগুলি বক্ষের হাড়ের সহিত শক্ত করিয়া জোড়া থাকিলে ইহা সম্ভব হইত না ) ফুস্‌ফুসে অধিক বায়ু আসিবার স্থান করিয়া দেয়। যখন শ্বাস-প্রশ্বাসের বিবরণ ( চতুর্থ পরিচ্ছেদ ) পড়িবে, তখন ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

**বাহুদ্বয়।** ধড়ের উপরের ভাগে উভয় দিকে এক এক খানি বাহু সংলগ্ন আছে। প্রত্যেক বাহুতে তিন ভাগ আছে। যথা (১) স্কন্ধ হইতে কনুই পর্য্যন্ত **প্রগণ্ড** (upper arm), (২) কনুই হইতে মণিবন্ধপর্য্যন্ত **প্রকোষ্ঠ** ( forearm ) এবং (৩) মণিবন্ধ হইতে নীচের অংশ **হস্ত**

চিত্র ৬—বাহুদ্বয়।
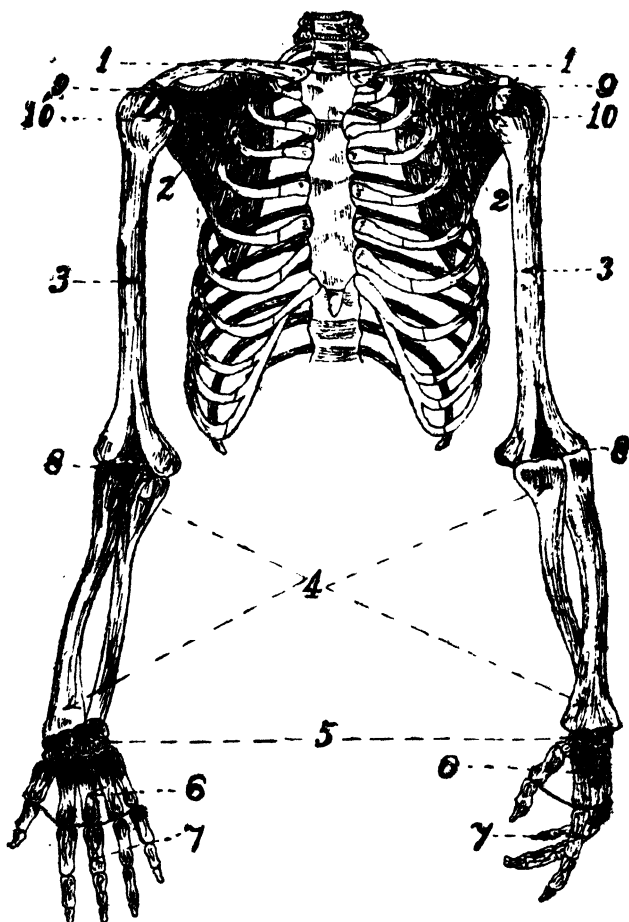
১—কণ্ঠের হাড়। ২—স্কন্ধের হাড়। ৩—প্রগণ্ডের হাড়। ৪—প্রকোষ্ঠের অস্থিদ্বয়। ৫—মণিবন্ধের হাড়। ৬—করতলের হাড়। ৭—অঙ্গুলির হাড়। ৮—কনুইএর গ্রন্থি। ৯—স্কন্ধের গ্রন্থি। ১০—স্কন্ধের অস্থির গর্ত্ত। ১১—প্রগণ্ডের গোল মস্তক।

বা হাত ( hand )। বত্রিশখানি হাড় দ্বারা এক এক খানি বাহু নির্ম্মিত হইয়াছে। ( ষষ্ঠ চিত্র )

ষষ্ঠ চিত্র হইতে তুমি দেখিবে যে, একখানি হাড় স্কন্ধ হইতে কনুই পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই হাড় দ্বারা প্রগণ্ড নির্ম্মিত। ইহার অগ্রভাগ বা মাথা গোল। এই গোলভাগ স্কন্ধের ত্রিকোণাকার হাড়ের গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করান রহিয়াছে। তজ্জন্যই গোল অংশ গর্ত্তের মধ্যে চারিদিকে ঘুরিতে পারে। এই কারণে আমরা বাহুদ্বয়কে চারিদিকে অনায়াসে ঘুরাইতে পারি।

চেপ্‌টা, ত্রিকোণাকার যে বড় বড় দুইখানি হাড় দুই স্কন্ধে আছে, তাহাকে স্কন্ধের হাড় বলে। আরও দুইখানি শক্ত হাড় স্কন্ধের হাড়কে স্বস্থানে রাখিয়াছে। এই হাড় দুইখানিকে **অংস-ফলক** বা গলার হাড় (collar bone) বলে। ইহার একদিক্ স্কন্ধের হাড়ের সহিত, অপর দিক্ বক্ষের হাড়ের অগ্রভাগের বা মাথার সহিত সংলগ্ন। বক্ষের উপরের ভাগে হাত দিলে তুমি দক্ষিণ ও বাম দিকে এই হাড় দুইখানি অনুভব করিতে পারিবে। রোগা লোকের এই হাড় বাহির হইয়া থাকে ও স্পষ্ট দেখা যায়। কথায় আমরা বলিয়া থাকি, "কি রোগা হয়ে গেছে! গলার হাড় বেরিয়ে পড়েছে!" ষষ্ঠ চিত্রে এই হাড় দুইখানি দেখান হইয়াছে।

প্রগণ্ডের হাড়ের নীচের দিক্‌টা চেপ্‌টা এবং প্রকোষ্ঠের দুইখানি হাড়ের সহিত সংলগ্ন। এই সংযোগ-স্থান বা গ্রন্থি অথবা গাঁঠকে আমরা কনুই বলি। এই গ্রন্থির সাহায্যেই আমরা প্রকোষ্ঠকে উপর-নীচু করিতে পারি; কিন্তু বাহুর মত চারিদিকে ঘুরাইতে পারি না। অতএব কনুইএর গ্রন্থি স্কন্ধের গ্রন্থির ন্যায় নহে। ইহা অনেকটা বাক্সের ঢাক্‌নির কব্জার ন্যায়।

প্রকোষ্ঠের হাড় দুইখানি পরস্পর এমন ভাবে সংলগ্ন আছে যে, ছোট হাড়খানি বড় হাড়খানির চারিদিকে কতকটা ঘুরিতে পারে। এইজন্য আমরা করতল অনেকটা ঘুরাইতে পারি।

প্রকোষ্ঠের এই হাড় দুইখানি নীচের দিকে **মণিবন্ধ** বা কব্জির সহিত সংলগ্ন। কব্জিতে দুই পাশে চার চার খানি করিয়া আট খানি অসমান ও ছোট হাড় আছে। কব্জির হাড়গুলি সম্মুখের দিকে করতলের হাড়ের সহিত সংলগ্ন।

করতলের পাঁচখানি হাড় পাঁচটী অঙ্গুলির হাড়ের সহিত সংলগ্ন। প্রত্যেক অঙ্গুলিতে তিনখানি করিয়া পাতলা হাড় আছে, কিন্তু অঙ্গুষ্ঠে কেবল দুইখানি হাড় আছে।

গণিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, কেবল হস্তেই ২৭খানি হাড়, এবং ১৫টী গ্রন্থি আছে। যদি তোমার হাতে এতগুলি পাতলা হাড় ও এতগুলি গ্রন্থি না থাকিত, তাহা হইলে তুমি হাত ও অঙ্গুলি সহজে ও তাড়াতাড়ি নাড়িতে বা বাঁকাইতে পারিতে না, ; অতএব হাত দিয়া কোন জিনিষ ধরিতে বা কোন প্রকার কাজ করিতে পারিতে না।

**পদদ্বয়।**—ধড়ের নীচের দিকে দুই পাশে দুই পদ সংলগ্ন রহিয়াছে। বাহুর মত, প্রত্যেক পদের তিন ভাগ আছে, যথাঃ—(১) **উরু**, (২) **জঙ্ঘা**, (৩) **পদতল** বা পা। (৭ম চিত্র)

প্রত্যেক পদে ত্রিশখানি করিয়া হাড় আছে।

সপ্তম চিত্রে তুমি দেখিতে পাইবে যে, কোমরের নিম্নভাগ হইতে জানু বা হাঁটু পর্য্যন্ত একখানি লম্বা হাড় আছে। ইহা উরুর হাড়। এই হাড় সকল হাড়ের অপেক্ষা অধিক লম্বা এবং দৃঢ়।

প্রগণ্ডের ন্যায়, উরুর হাড়ের অগ্রভাগও গোল। এই গোল অগ্রভাগটী উপরের এক চেপ্‌টা এবং বড় হাড়ের গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করান রহিয়াছে। এই চেপ্‌টা হাড়কে কোমরের হাড় বলে। কোমরের দুই পাশে এই দুই হাড় আছে। তুমি কোমরের দুই দিকে হাত দিয়া টিপিয়া দেখিলে এই দুইখানি হাড় অনায়াসে অনুভব করিতে পারিবে। কোমরের হাড় ও উরুর

হাড় মিলিয়া যে গ্রন্থি রচিত হইয়াছে, সেই গ্রন্থির সাহায্যেই আমরা পদকে বাঁকাইতে এবং নানাদিকে ঘুরাইতে পারি।

তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, তোমার বাহুর মত, পদদ্বয়কে তত সহজে ঘুরাইতে ফিরাইতে পার না। ইহার কারণ কি? কারণ বলিতেছি, শুন।

কোমরের গ্রন্থি অনেকটা স্কন্ধের গ্রন্থির মত বটে, কিন্তু অবিকল নয়। সপ্তম চিত্রে তুমি দেখিবে যে, যে গর্ত্তের মধ্যে উরুর হাড় প্রবেশ করিয়াছে, তাহা স্কন্ধের হাড়ের গর্ত্ত অপেক্ষা অধিক গভীর। অতএব উরুর হাড় কোমরের হাড়ের গর্ত্তের মধ্যে অধিকতর প্রবেশ করিয়াছে। প্রগণ্ডের হাড় স্কন্ধের হাড়ের গর্ত্তের মধ্যে এতটা প্রবেশ করে না। এইজন্য প্রগণ্ডের হাড়ের ন্যায়, উরুর হাড় চারিদিকে তত সহজে ঘুরিতে ফিরিতে পারে না। যদি কোমরের হাড়ের গর্ত্ত এত গভীর না হইত, তাহা হইলে পাও বাহুর মত অনায়াসে চারিদিকে

চিত্র ৭—পদ।

১—উরুর হাড়। ২—জঙ্ঘার হাড়। ৩—হাঁটু। ৪—কোমরের গ্রন্থি। ৫—কোমরের হাড়। ৬—কোমরের গর্ত্ত। ৭—উরুর হাড়ের গোল মাথা বা অগ্রভাগ। ৮—মালাই চাকি। ৯—গুল্‌ফ। ১০—পদতলের হাড়। ১১—অঙ্গুলির হাড়। ১২—রবারের মত দড়ি—যাহা দিয়া উরুর হাড় কোমরের হাড়ের সহিত বাঁধা।

ঘুরিতে ফিরিতে পারিত। কিন্তু তাহা হইলে আমাদের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিত। কেননা, পদদ্বয় শরীরের উপরের অংশ ধারণ করিয়া আছে; যদি পা এইরূপ ভাবে দৃঢ়সংলগ্ন না থাকিত, তাহা হইলে উহা শরীরের ভার বহন করিতে অসমর্থ হইত এবং আকস্মিক পতনের বা দৌড়িবার সময় পায়ে একটু আঘাত লাগিলেই উরুর হাড়ের মাথা গর্ত্ত হইতে খুলিয়া আসিত। যাহাতে ইহা সহজে খুলিয়া না আসিতে পারে তজ্জন্য ইহা কোমরের হাড়ের গর্ত্তের সহিত রবারের ন্যায় একটী দৃঢ় বন্ধনীর দ্বারা বাঁধা আছে। (১২, ৭ম চিত্র)

এইজন্য উরুর হাড় অধিক পরিমাণে গভীর গর্ত্তের মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছে। উহা গভীর গর্ত্তের মধ্যে প্রবিষ্ট আছে বলিয়া শীঘ্র বাহির হইয়া আসিতে পারে না। বাহুকে নানাদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেক কাজ করিতে হয়; উহাকে শরীরের কোন অংশের ভার বহন করিতে হয় না। সহজে ঘুরিতে ফিরিতে পারিবে বলিয়া উহা অগভীর গর্ত্তের মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছে।

উরুর হাড়ের নীচের দিক জানু বা হাঁটুতে জঙ্ঘার হাড়ের সহিত সংলগ্ন। ইহাতে যে গ্রন্থি হইয়াছে, তাহাকে জানু বা হাঁটু বলে। এই গ্রন্থির সাহায্যে আমরা জঙ্ঘাকে উপর-নীচু করিতে পারি। হাঁটুর গ্রন্থি কনুইয়ের গ্রন্থির মত। প্রভেদ এই যে, হাঁটুর উপর একখানি চেপ্‌টা হাড় আছে। উহাকে চলিত কথায় 'মালাই চাকি' বলে। ইহা হাঁটুর গ্রন্থিকে রক্ষা করিয়া আছে।

জঙ্ঘাতে দুইখানি হাড় আছে; একখানি মোটা এবং বড়, অপরখানি সরু এবং একটু ছোট। শেষোক্ত হাড়ের উপরের দিক পূর্ব্বোক্ত হাড়ের মাথার সহিত সংলগ্ন। জঙ্ঘা টিপিয়া দেখিলে, সম্মুখের বড় হাড়খানি অনুভব করিতে পারিবে।

জঙ্ঘার এই হাড় দুইখানি নীচের দিকে গুল্‌ফ বা পায়ের গ্রন্থির সহিত

সংলগ্ন। পায়ের গ্রন্থি সাতখানি অসমান, স্থূল এবং দৃঢ় হাড় দ্বারা প্রস্তুত।

পায়ের গ্রন্থির হাড়গুলি পায়ের হাড়ের সহিত সংলগ্ন। হস্তের ন্যায় পদতলেও পাঁচখানি এবং অঙ্গুলিতে চৌদ্দখানি ছোট ফাঁপা হাড় আছে—প্রত্যেক অঙ্গুলিতে তিনখানি ও অঙ্গুষ্ঠে কেবলমাত্র দুইখানি।

ষষ্ঠ এবং সপ্তম চিত্র হইতে তুমি দেখিবে যে, হাতের হাড়ের অপেক্ষা পায়ের হাড়গুলি অধিক স্থূল এবং দৃঢ়, কিন্তু লম্বায় ছোট। কেন? পা ও হাত একই কাজ করে না, ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে। পায়ের হাড়গুলি শরীরের ভার বহন করে এবং হাতের হাড়গুলি এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া নানা কাজ করে। পায়ের হাড় হাতের হাড়ের ন্যায় পাতলা হইলে শরীরের ভার বহন করিতে পারিত না। এইজন্য পায়ের হাড় স্থূল ও দৃঢ়।

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## মাংস-পেশী।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তোমরা পড়িয়াছ যে, আমাদের শরীরের কঙ্কাল বিবিধ আকারের অনেকগুলি হাড় দ্বারা প্রস্তুত এবং রবারের ন্যায় একপ্রকার দড়ি দ্বারা এই হাড়গুলি যথাস্থানে রক্ষিত হইয়াছে।

এই পরিচ্ছেদে তোমাদিগকে এই সকল হাড়ের আবরণ অর্থাৎ মাংসের বিষয় কিছু বলিব।

শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে টিপিয়া দেখিলে তুমি দেখিতে পাইবে যে, তোমার শরীরের প্রায় সকল স্থানেই ছোট বা বড় মাংসপিণ্ড আছে। (৮ম চিত্র)। এই প্রকার এক একটী মাংসপিণ্ডকে মাংস-পেশী বলে। মানুষের শরীরে ছোট বড় সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৫০০ মাংস-পেশী আছে।

মনুষ্যশরীরের উপরের চামড়া ছাড়াইয়া ফেলিলে মাংস-পেশী সকল দেখা যায়। ৮ম চিত্রে এইরূপে মাংস-পেশী দেখান হইয়াছে।

মাংস-পেশীর এক বিশেষত্ব এই যে, উহা ছোট এবং মোটা হইতে পারে এবং পুনরায় পূর্ব্বের আকার ধারণ করিতে পারে। অতএব পেশী অনেকটা রবারের ন্যায়। রবার টানিলে বড় হয়, ছাড়িয়া দিলে ছোট হয়। মাংস-পেশীও ঠিক এইরূপ।

মাংস-পেশীর আর এক বিশেষত্ব এই যে, উহা প্রায়শঃ দুই প্রান্তে সরু, কিন্তু মধ্যভাগে মোটা হইয়া থাকে। তাহার সরু শেষভাগ দুইটী
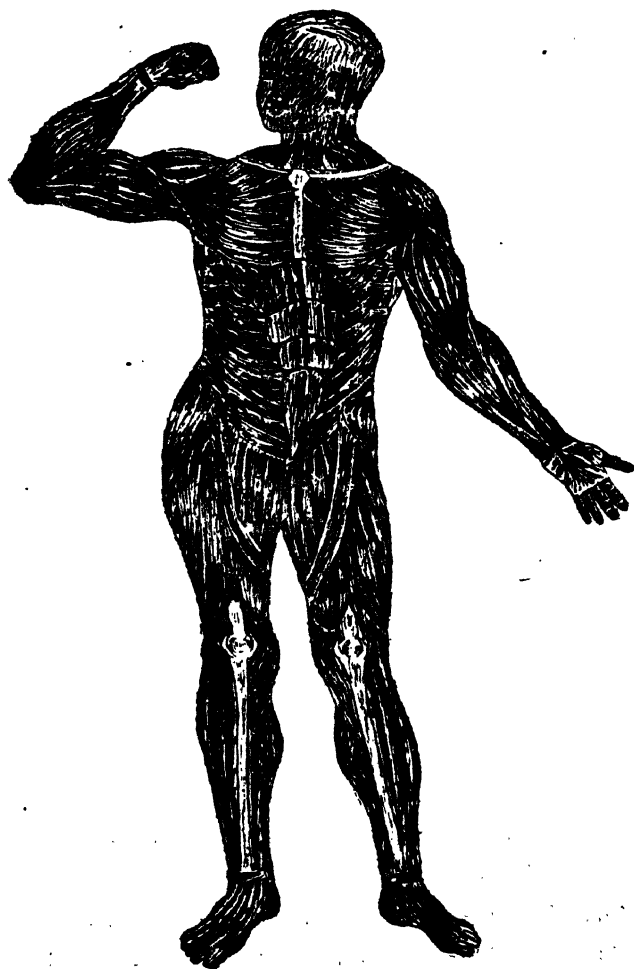
চিত্র ৮—শরীরের মাংস-পেশী সমূহ।

একপ্রকার শক্ত, উজ্জ্বল, শাদা দড়ি (tendon বা sinews) দ্বারা হাড়ের সহিত বাঁধা। এইরূপ দড়িকে বন্ধনী বলা যাইতে পারে।
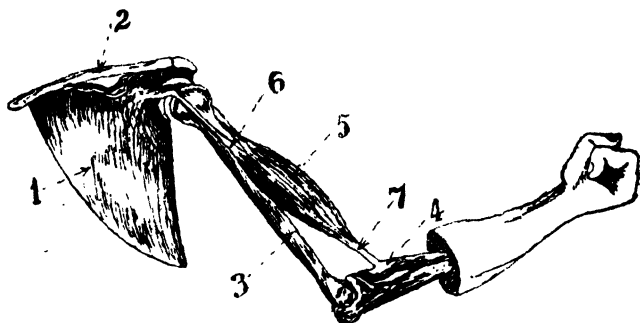
চিত্র ৯—প্রগণ্ডের সম্মুখের মাংস-পেশী।

১—স্কন্ধের হাড়। ২—কণ্ঠের হাড়। ৩—প্রগণ্ডের হাড়। ৪—প্রকোষ্ঠের হাড়। ৫—প্রগণ্ডের সম্মুখের মাংস-পেশী। ৬, ৭—বন্ধনী (tendon বা sinews)।

৯ম চিত্রে প্রগণ্ডের সম্মুখে যে পেশী আছে, তাহা দেখান হইয়াছে। এই পেশীর উপরের দিক দুইটী বন্ধনী (রবারের ন্যায় দড়ি) দ্বারা স্কন্ধের হাড়ের সহিত বাঁধা এবং নীচের দিকে একটীমাত্র বন্ধনী দ্বারা প্রকোষ্ঠের ছোট হাড়ের সহিত বাঁধা রহিয়াছে।

যখন এই পেশী ছোট হয় তখন উহা প্রকোষ্ঠকে স্কন্ধের দিকে টানিয়া লয়। এইরূপে মাংস-পেশী সকল সঙ্কুচিত হইয়া শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সঞ্চালিত করে।

অঙ্গ-সঞ্চালনই মাংস-পেশীর প্রধান কাজ। এই মাংস-পেশী সকলের সাহায্যেই আমরা দাঁড়াইতে, বসিতে, বেড়াইতে, দৌড়িতে, সাঁতার দিতে, খাইতে, কথা কহিতে, লিখিতে, হাসিতে এবং অন্যান্যরূপ অঙ্গ সঞ্চালন

করিতে পারি। মাংস-পেশী না থাকিলে, অস্থি-গ্রন্থি থাকা সত্ত্বেও হাড়গুলি নড়িত না এবং শরীরের কোন অঙ্গেরই সঞ্চালন হইত না।

প্রগণ্ডের সম্মুখে এবং পশ্চাতে (৯ম চিত্র), উরুর সম্মুখে এবং পশ্চাতে ও জঙ্ঘার পশ্চাতে যে মাংস-পেশীগুলি আছে, তাহা আমাদের শরীরের মধ্যে সকল মাংস-পেশী অপেক্ষা বড়। যখন তুমি তোমার বাহু বা পদ সঞ্চালন করিতে ইচ্ছা কর, তখনই সেইস্থানের মাংস-পেশী সঙ্কুচিত হইয়া তোমার বাহু বা পদকে সঞ্চালিত করে। তুমি যদি ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে তোমার পা নড়িতে পারে না, কিম্বা তোমার বাহু কোনও দ্রব্য উঠাইতে পারে না। তবেই দেখিতেছ যে, তোমার বাহুর এবং পায়ের মাংস-পেশীগুলি তোমার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী। দেহের অধিকাংশই এইরূপ মাংস-পেশী দ্বারা আবৃত। এই প্রকার মাংস-পেশীরই চিত্র ৮ম চিত্রে দেখান হইয়াছে।

আরও এক প্রকার মাংস-পেশী আছে, যাহা আমাদের বশে নাই। যথা,—পঞ্জর-মধ্যস্থিত মাংস-পেশীগুলি, যাহা শ্বাস লইবার সময় আমাদের বক্ষঃস্থলকে স্ফীত ও সঙ্কুচিত করে।

রাত্রিতে যখন আমরা ঘুমাইয়া থাকি, তখনও এই পেশীগুলি আপনা হইতেই স্ফীত ও সঙ্কুচিত হইয়া শ্বাস লইবার সাহায্য করে। ইহাদের চালনা আমাদের আয়ত্তে নাই; আমরা ইচ্ছা করিলে ইহাদের গতির রোধ করিতে পারি না। যদি তুমি বক্ষঃস্থলের গতি বা স্ফীতি রোধ কর, তাহা হইলে সেই সঙ্গে তোমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবে।

অতএব তুমি দেখিতেছ যে, যে মাংস-পেশী শ্বাস লইতে তোমাকে সাহায্য করিতেছে, তাহা তোমার বশে নাই। এইরূপ আরও মাংস-পেশী আছে তাহার দৃষ্টান্ত পরে পাইবে। এইরূপ অধিকাংশ পেশী বক্ষের এবং উদরের ভিতরেই আছে।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## রক্ত ও রক্তের সঞ্চালন।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তোমরা পড়িয়াছ যে, মাংস-পেশী সঙ্কুচিত হইয়া আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সঞ্চালিত করে এবং এইরূপ সঞ্চালন দ্বারাই আমরা নানারূপ কাজকর্ম্ম করিতে পারি।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন-হেতু আমাদের মাংস ক্রমাগত ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। কাষ্ঠ বা কয়লা পোড়াইলে যেরূপ ভস্ম উৎপন্ন হয় সেইরূপ এই মাংস-পেশীর ক্ষয়ের জন্য একপ্রকার ময়লা বা আবর্জ্জনা উৎপন্ন হইতেছে। অতিসামান্য ও ক্ষুদ্র অঙ্গ সঞ্চালন (যথা, চক্ষুর পাতা বা অঙ্গুলি নাড়ান) জন্যও আমাদের মাংস-পেশীর ক্ষয় হইতেছে।

যদি তুমি কয়েকদিন কিছু আহার না কর, তাহা হইলে দেখিবে যে, তোমার পেশীগুলি ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। তখন তুমি তোমার পেশী দ্বারা পূর্ব্ববৎ কাজ করিতে পারিবে না।

এই মাংস-পেশীর ক্ষয় পূর্ণ করিবার জন্য আমরা প্রত্যহ আহার করিয়া থাকি। আহার্য্য হইতে আমাদের মাংস হয়। কেমন করিয়া হয়? রক্ত আহার্য্য হইতে মাংস প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত পদার্থ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া দেয়। এ বিষয়ে তোমরা পরে আরও জানিতে পারিবে।

রক্ত এইরূপে মাংস প্রস্তুত করে। কিন্তু মাংস ক্ষয় হইয়া যে আবর্জ্জনা (ক্ষয়প্রাপ্ত মাংস) উৎপন্ন হয়, তাহা কি হয়? এই আবর্জ্জনাকেও

রক্তই শরীর হইতে নির্গত করিয়া দেয়। যদি এইগুলি শরীরে থাকিয়া যায়, তাহা হইলে নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এখন রক্ত শরীরকে কিরূপে পোষণ করে এবং ইহার আবর্জ্জনা কিরূপে দূর করে তাহাই বলিতেছি।

**রক্ত ও রক্তের সঞ্চালন।** তোমরা বোধ হয় জান যে, রক্ত লাল ও তরল, এবং জল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গাঢ়। কিন্তু বিশুদ্ধ রক্তেরই রঙ্ লাল। শরীরের আবর্জ্জনা ও দূষিত পদার্থ যখন রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন রক্ত তত লাল থাকে না, অনেকটা বেগুনি রঙের ন্যায় হইয়া যায়।

চুল ও নখ ছাড়া শরীরের সকল স্থানেই রক্ত আছে। এইজন্য শরীরের যে কোন স্থানে আলপিন বা স্চ বিদ্ধ করিলে রক্ত নিঃসৃত হয়।

তোমরা হয় ত ভাবিতে পার যে, বোতলে যেমন জল থাকে শরীরেও তেমনি ভাবে রক্ত আছে। কিন্তু তাহা নহে। রক্ত সর্ব্বদা শরীরের মধ্যে চলাচল করিতেছে; এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকে না। শরীরের সর্ব্বত্র ছোট ছোট বা বড় বড় নল আছে। এই সকল নল দ্বারা রক্ত শরীরের সকল স্থানে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছে।

বক্ষের বামদিকে হাত দিলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করিতে পারিবে। এই হৃৎপিণ্ডই শরীরের সর্ব্বত্র রক্তকে সঞ্চালিত করে। (১০ম চিত্র)। বোধ হয় তোমরা জলের কলে কিরূপ ভাবে জল আইসে জান। সহরের একস্থানে বড় ট্যাঙ্ক বা পুকুরে জল বিশুদ্ধ করিয়া রাখা হয়, উহা হইতে সহরের সর্ব্বত্র জল সরবরাহ করা হয়। আমাদের শরীরেও ঠিক এই ভাবে রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে। হৃৎপিণ্ডটী যেন একটী রক্তের ছোট পুকুর, এই স্থান হইতেই নলের দ্বারা শরীরের সর্ব্বত্র রক্ত প্রবাহিত হইতেছে।

**হৃৎপিণ্ড।** হৃৎপিণ্ড বক্ষের হাড়ের নীচের দিকে বাম ভাগে অবস্থিত। হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলে যত বড় হয়, হৃৎপিণ্ডও প্রায় তত বড়।

ইহার উপর দিক দক্ষিণ দিকে এবং নীচের দিক বাম দিকে হেলিয়া আছে। উহার উপরের ভাগ নীচের ভাগ অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত। ইহার আকৃতি অনেকটা মোচার মত। ইহা স্থূল এবং দৃঢ় মাংস-পেশী দ্বারা প্রস্তুত।

তোমরা জান, বক্ষের ভিতরে হৃৎপিণ্ড সর্ব্বদা স্পন্দিত হয়। ইহার কারণ এই যে, হৃৎপিণ্ডের মাংস-পেশী সর্ব্বদা আপনা হইতেই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতেছে। এই মাংস-পেশী আমাদের বশে নাই। তুমি ইচ্ছা করিলেই অন্য মাংস-পেশীর ন্যায়, হৃৎপিণ্ডের মাংস-পেশীকে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করিয়া হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আরম্ভ বা স্থগিত করিতে পার না।

হৃৎপিণ্ড ভিতরে ফাঁপা এবং সর্ব্বদা রক্তে পরিপূর্ণ থাকে। হৃৎ-পিণ্ডের ভিতরে চারিটী সমান ছোট ছোট কোষ্ঠ আছে; দক্ষিণ দিকে দুইটী (একটী নীচে, একটী উপরে) এবং বাম দিকে দুইটী। (একটী নীচে, একটী উপরে)। হৃৎপিণ্ড পাতলা মাংস-পেশীর পর্দ্দা দ্বারা এই চারিটী কোষ্ঠে বিভক্ত হইয়াছে।

উপরের কোষ্ঠ হইতে নীচের কোষ্ঠে রক্ত চলাচলের জন্য প্রত্যেক দিকে একটী ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রের উপরে একটী 'দ্বার' (৫, ৬) আছে। এই দ্বার কেবল এক দিকেই খোলে। এই দ্বার এইরূপ ভাবে খোলে যে, রক্ত উপরের কোষ্ঠ হইতে নীচের কোষ্ঠে অনায়াসে যাইতে পারে, কিন্তু নীচের কোষ্ঠ হইতে উপরের কোষ্ঠে যাইতে চাহিলে আপনা হইতেই তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়।

হৃৎপিণ্ডের বাম দিকে বিশুদ্ধ রক্ত থাকে। বিশুদ্ধ রক্তের রঙ্ লাল। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ দিকে দূষিত রক্ত থাকে। দূষিত রক্তের রঙ্ ততটা লাল নহে, অনেকটা বেগুনি। লাল ও বেগুনি রক্তের স্থান দেখাইবার জন্যই চিত্রে হৃৎপিণ্ডের বাম দিকে লাল ও দক্ষিণ দিকে বেগুনি রঙ্ দেওয়া হইয়াছে। (১০ম ও ১১শ চিত্র)

একাদশ চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তুমি দেখিবে যে, ছোট বড়

চিত্র ১১।

হৃৎপিণ্ডের ভিতরের দৃশ্য। (২২ পৃষ্ঠা)

১, ২, ৩, ৪—হৃৎপিণ্ডের চারিটী কোষ্ঠ। ৫, ৬—দ্বার। ৭—এওরটা ধমনী।
—যে রক্ত-নল দূষিত রক্ত ফুস্‌ফুসে লইয়া যাইতেছে। ৯ ও ১০—৭ ও ৮এর দ্বার।
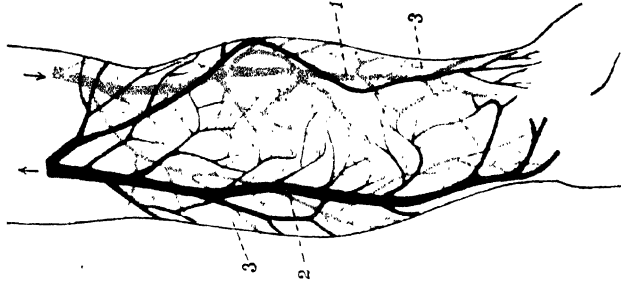
চিত্র ১২ (২৭ পৃঃ)—ধমনী, শিরা ও চুলের মত সূক্ষ্ম রক্ত-নল।
(১)—ধমনী। (২)—শিরা (৩)—চুলের মত সূক্ষ্ম রক্ত-নল।

নানা আকারের কতকগুলি নল হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়াছে। হৃৎপিণ্ড এই নল দ্বারা শরীরের সর্ব্বত্র রক্ত সঞ্চালন করে। যে নল-গুলিতে লাল রঙ্ দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিতে বিশুদ্ধ রক্ত আছে এবং যেগুলিতে বেগুনি রঙ্ দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিতে দূষিত রক্ত আছে।

এইবার তোমরা বুঝিতে পারিবে, হৃৎপিণ্ড কি করিয়া শরীরের সকল স্থানে রক্ত সঞ্চালন করিয়া থাকে।

আমরা হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ দিকের দূষিত রক্তের বিষয় প্রথমে আলোচনা করিব। ক্ষয়প্রাপ্ত মাংসের দূষিত পদার্থগুলি রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, সুতরাং রক্ত দূষিত হইয়া বেগুনি হইয়া যায়। সর্ব্বাঙ্গের দূষিত পদার্থ লইয়া রক্ত হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণদিকের উপরের কোষ্ঠে আসিয়া একত্র হয়। এই কোষ্ঠের সহিত দুইটী নল সংলগ্ন আছে। (চিত্র ১০)। এই দুইটী নল দ্বারা দূষিত রক্ত হৃৎপিণ্ডে আইসে; একটী নল শরীরের ঊর্দ্ধভাগের দূষিত. রক্ত এবং অন্যটী শরীরের অধোভাগের দূষিত রক্ত লইয়া আইসে। এই নল দুইটী তোমাদের অঙ্গুলির মত মোটা। ইহাদের মধ্যে দূষিত রক্ত থাকে। ইহা দেখাইবার জন্য চিত্রে এই দুইটী নলে বেগুনি রঙ্ দেওয়া হইয়াছে।

যখন হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ দিকের উপরের কোষ্ঠ (১, চিত্র ১১) দূষিত রক্তে সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া যায়, তখন উহা সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করে। সঙ্কুচিত হইলে উহার দ্বারে (৫, চিত্র ১১) চাপ পড়ে। চাপের প্রভাবে দ্বার খুলিয়া যায় এবং সমস্ত রক্ত নীচের কোষ্ঠে (৩, চিত্র ১১) চলিয়া আইসে। একটী ছোট রবারের গোলকে ছিদ্র করিয়া উহাকে জলপূর্ণ করিয়া চাপ দিলে কি প্রকারে জল বাহির হইতে থাকে তাহা বোধ হয় তোমরা দেখিয়াছ। হৃৎপিণ্ডের কোন কোষ্ঠ সঙ্কুচিত হইতে থাকিলে ঠিক সেই প্রকারে উহার দ্বার দিয়া সমস্ত রক্ত নীচের কোষ্ঠে চলিয়া যায়।

তাহা হইলে এই নীচের কোষ্ঠটীও (৩, চিত্র ১১) রক্তে পূর্ণ হইল; এবং পূর্ণ হওয়া মাত্রই কোষ্ঠ সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হইল। ইহার উপরের দ্বারে

(৫, চিত্র ১১) চাপ পড়িবামাত্র উহা তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়। অতএব রক্ত পুনরায় উপরের কোষ্ঠে ফিরিয়া আসিতে পারে না। কিন্তু চাপের প্রভাবে রক্তকে কোন দিকে যাইতে হইবে ত। রক্ত দ্বিতীয় ছিদ্র (৯, চিত্র ১১) দ্বারা একটী বড় নলে প্রবেশ করে। এই নলটী হৃৎপিণ্ডের উপরে অল্প দূর যাইয়া দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এক শাখা দক্ষিণ দিকের ফুস্‌ফুসে এবং অন্য শাখা বাম দিকের ফুস্‌ফুসে গিয়াছে। (চিত্র ১০)। ইহা লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, এই বড় নল ও তাহার শাখা দুইটীর রঙ্‌ চিত্রে বেগুনি করা হইয়াছে, কারণ উহারা উভয় ফুস্‌ফুসে যে রক্ত লইয়া ফেলিতেছে তাহা দূষিত রক্ত।

ফুস্‌ফুস্‌ কতকটা ত্রিকোণ থোলের মত। (চিত্র ১০)। দূষিত বেগুনি রক্ত ফুস্‌ফুসে যাইয়া পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হইয়া আবার রক্তবর্ণ হয়। কি করিয়া রক্তের আবর্জ্জনা ফুস্‌ফুসের ভিতরে বিদূরিত হয় তাহা তোমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ পাঠ করিলে জানিতে পারিবে।

ফুস্‌ফুসে যাইয়া পরিষ্কার হইয়া লাল-বর্ণ ধারণ করিয়া, সেই রক্ত চারিটী নল দ্বারা পুনরায় হৃৎপিণ্ডের বামে উপরের কোষ্ঠে (২, চিত্র ১১) আইসে। এই নলগুলিতে পরিষ্কার লাল রক্ত থাকে বলিয়া চিত্রে উহাদের রঙ্‌ লাল করা হইয়াছে। (চিত্র ১১)

হৃৎপিণ্ডের বামে উপরের কোষ্ঠ (২, চিত্র ১১) লাল রক্তে পরিপূর্ণ হইবামাত্র, উহা সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করে। সঙ্কোচের জন্য রক্তের চাপে নীচের দ্বার (৬, চিত্র ১১) খুলিয়া যায়। রক্ত তখন নীচের কোষ্ঠে (৪, চিত্র ১১) যাইয়া বিশ্রাম করিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু ইহা বিশ্রাম করিতে পায় না। ঐ নীচের কোষ্ঠ (৪, চিত্র ১১) সঙ্কুচিত হইয়া রক্তকে সেই স্থান হইতে তাড়াইয়া দেয়। উপরের দ্বার (৬, চিত্র ১১) তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়। তখন রক্ত দ্বিতীয় ছিদ্র (১০, চিত্র ১১) দ্বারা উপরের দিকে এওর্‌টা (aorta) নামক বড় নলের (৭,

চিত্র ১১) ভিতর দিয়া যাইতে থাকে। এই নলটী সকল নলের অপেক্ষা বড়, ইহা তোমার অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় স্থূল হইবে।

হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া এওর্‌টা অল্প দূর উপরের দিকে গিয়াছে; তাহার পর বাঁকিয়া দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখা মস্তকের দিকে, অপর শাখাটী পুনরায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই বাহুর দিকে গিয়াছে। ইহার আরও অনেক শাখা-প্রশাখা ধড়ের নিম্নদেশে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এওর্‌টা পৃষ্ঠের মধ্যে আসিয়া দুইটী বড় বড় শাখায় বিভক্ত হইয়া পদদ্বয়ে চলিয়া গিয়াছে। (চিত্র ১০)

এওর্‌টার এই বড় বড় শাখাগুলি হইতে প্রশাখা বাহির হইয়াছে। আবার ঐ প্রশাখা হইতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা বাহির হইয়াছে এবং প্রশাখার শাখা হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা বাহির হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র শাখাগুলি চুলের মত সূক্ষ্ম হইবে। (চিত্র ১০ ও ১২)

এই প্রকার চুলের মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য রক্তের নল আমাদের শরীরের সর্ব্বত্র আছে। এইজন্য শরীরের যে কোন স্থানে আল্‌পিন বিদ্ধ করিলে রক্ত বাহির হয়।

পরিষ্কৃত রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া এওর্‌টার মধ্যে যায় এবং তাহা হইতে তাহার বড় বড় ও ছোট ছোট শাখা-প্রশাখার মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃত হয়; অবশেষে রক্ত চুলের মত সূক্ষ্ম নলের মধ্যে আসিয়া পড়ে। এই সকল নলের আবরণ বা চাম্‌ড়া অত্যন্ত পাতলা। রক্ত, এই চামড়ার মধ্য দিয়া ক্ষয়-প্রাপ্ত মাংস-পেশীকে নূতন মাংস প্রস্তুত করিবার সামগ্রী আনিয়া দেয় এবং মাংস-পেশীর আবর্জ্জনা (ক্ষয়-প্রাপ্ত মাংস) স্বয়ং গ্রহণ করে। সুতরাং ক্রমে ক্রমে পরিষ্কৃত লাল রক্ত আবর্জ্জনায় পূর্ণ হইয়া বেগুনি রঙ্‌ ধারণ করে।

সর্ব্বাঙ্গের এই দূষিত রক্ত চুলের মত সূক্ষ্ম অন্যান্য নলে প্রবাহিত হয়। এইরূপ অনেকগুলি ছোট ছোট নল মিলিয়া অনেকগুলি বড় নল হইয়াছে।

রক্ত তাহার পর ইহার মধ্যে আইসে। তাহার পরে আরও বড় বড় নলের মধ্যে আইসে। অবশেষে পূর্ব্বোক্ত ( চিত্র ১০ ) বড় বড় দুইটী নল দিয়া হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ দিকের উপরের কোষ্ঠে উপস্থিত হয়। সেখান হইতে সেই দূষিত রক্ত ফুস্ ফুসে যাইয়া পরিষ্কৃত হইয়া হৃৎপিণ্ডের বামদিকে প্রবেশ করে। এখান হইতে আবার এওরটা দিয়া শরীরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং উহা পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া আবার শরীরের সকল স্থানে ছড়াইয়া যায়।

আমাদের শরীরে দিবারাত্রি, জন্ম হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত অনবরত এইরূপ ব্যাপার চলিতেছে।

হৃৎপিণ্ডের উপরের দুইটী কোষ্ঠ একসঙ্গে সঙ্কুচিত হইয়া চাপ দিয়া নীচের কোষ্ঠ দুইটীতে রক্তকে প্রেরণ করে। তখন নীচের কোষ্ঠ দুইটী প্রসারিত হইয়া সেই রক্তকে তথায় আসিতে দেয়। তাহার পরে নীচের কোষ্ঠ দুইটী সঙ্কুচিত হইয়া রক্তকে ফুস্‌ফুসে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করে। তখন উপরের কোষ্ঠ দুইটী প্রসারিত হইয়া ফুস্‌ফুস্ এবং শরীরের অন্যান্য স্থান হইতে আগত রক্তকে তথায় আসিতে দেয়। যখন নীচের কোষ্ঠ দুইটী সঙ্কুচিত হয়, তখন উপরের কোষ্ঠ দুইটী প্রসারিত হয়, এবং নীচের কোষ্ঠ দুইটী যখন প্রসারিত হয়, তখন উপরের কোষ্ঠ দুইটী সঙ্কুচিত হয়। এইরূপে হৃৎপিণ্ড ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া সর্ব্বদা রক্তকে শরীরের সকল স্থানে প্রেরণ করিতেছে। ইহার আর বিরাম নাই। বক্ষের বাম দিকে হাত দিলে আমাদের হৃৎপিণ্ডের এই প্রসারণ ও সঙ্কোচনক্রিয়া অনুভব করিতে পারি।

প্রায় ৩০ সেকেণ্ডে এক ফোঁটা রক্ত হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণদিকের উপরের কোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া পুনরায় সেইস্থানে ফিরিয়া আইসে। ইহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, রক্তের চলাচল কিরূপ দ্রুত।

**ধমনী ও শিরা।** যে নলে পরিষ্কার রক্ত থাকে তাহাকে **ধমনী** ( artery ) বলে এবং যে নলে দূষিত রক্ত থাকে তাহাকে **শিরা** ( vein ) বলে।

চুলের মত যে সূক্ষ্ম রক্ত-নলের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহারা ক্ষুদ্রতম ধমনী ও শিরাগুলিকে পরস্পরের সহিত যোগ করিতেছে। দ্বাদশ চিত্রে তাহা দেখান হইয়াছে। তোমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধমনী ও শিরাগুলি স্থূলতর করিয়া দেখান হইয়াছে।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## শ্বাস-যন্ত্র।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, আবর্জ্জনাপূর্ণ বেগুনি রক্ত ফুস্‌ফুসে যাইয়া পরিষ্কৃত এবং লাল হয়। ফুস্‌ফুসে কি প্রকারে রক্ত আবর্জ্জনা-মুক্ত হয়, তাহা বলিতেছি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ফুস্‌ফুস্ কি এবং কি জন্য আমাদের শরীরে আছে, তাহা জানা আবশ্যক।

**ফুস্‌ফুস্।** তোমার গলার সম্মুখে বক্ষের হাড়ের একটু উপরে অঙ্গুলি দিয়া টিপিয়া দেখিলে একটী শক্ত নালী ( শ্বাসনালী ) আছে অনুভব করিবে। ঐ স্থানে একটু জোরে চাপিয়া ধরিলে তোমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবে। ঐ নালী মুখগহ্বরের পশ্চাদ্ভাগের সহিত ও নাসিকার গহ্বরের সহিত সংযুক্ত আছে।

আমরা সাধারণতঃ নাসিকা দ্বারাই নিশ্বাস লই; কখন কখন মুখ দ্বারাও লইয়া থাকি। কিন্তু যেরূপেই নিশ্বাস লই না কেন নিশ্বাসবায়ু ঐ নালী দিয়াই যাইবে। এইজন্য এই নালীকে আমরা "শ্বাস-নালী" (১, চিত্র ১৩) বলিব। এই নালী মুখগহ্বরের পশ্চাৎ হইতে নীচে বক্ষের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে।

বক্ষে প্রবেশ করিয়া এই শ্বাসনালী দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে; এক শাখা দক্ষিণদিকে ও একশাখা বামদিকে গিয়াছে। প্রত্যেক শাখা শতসহস্র প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রশাখাও পুনরায় অসংখ্য শাখায় বিভক্ত

হইয়াছে। প্রশাখার শাখাও লক্ষ লক্ষ শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এইরূপ অগণিত শাখা-প্রশাখা-বিভক্ত হইয়া শ্বাস-নালী অবশেষে অতি ক্ষুদ্র এবং
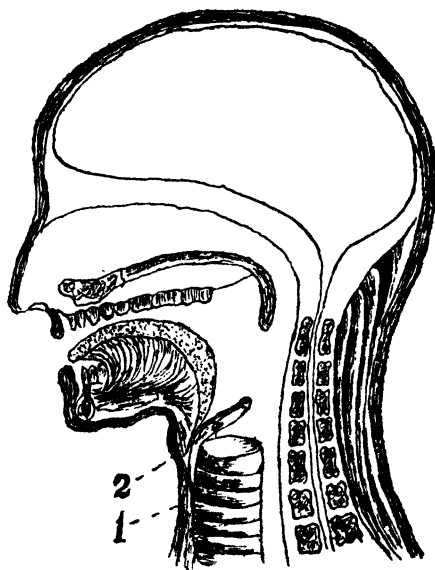
চিত্র ১৩।

( ১ )—শ্বাসনালী ( ২ )—আল্‌জিব্‌।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোষ্ঠে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক সূক্ষ্মনালীর অগ্রভাগে প্রায় ১৭০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ্ঠ আছে। ঐ কোষ্ঠগুলির আবরণ অতি-পাতলা চামড়াদ্বারা নির্ম্মিত। এই সূক্ষ্ম কোষ্ঠগুলির সহিত শ্বাসনালীর সংযোগ থাকায় ইহারা সর্ব্বদা বায়ুপূর্ণ থাকে। অতএব ইহাদিগকে "বায়ু-কোষ্ঠ" (air cells) বলা যাইতে পারে।

বক্ষের প্রত্যেক দিকে এইরূপ প্রায় ৩০০ লক্ষ বায়ু-কোষ্ঠ আছে।

নিম্নাঙ্কিত চিত্রে কেবলমাত্র কতকগুলি বায়ু-কোষ্ঠ দেখান হইয়াছে; কারণ এত অল্প স্থানে এতগুলি কোষ্ঠ দেখান অসম্ভব।
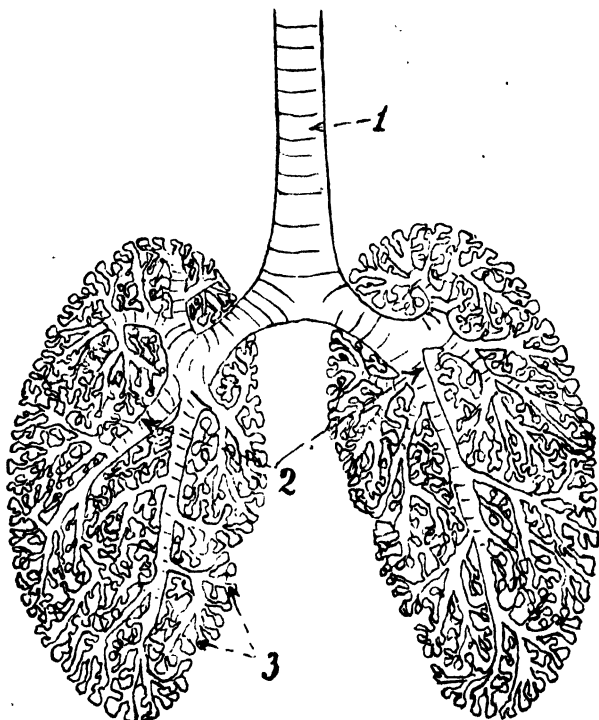
চিত্র—১৪ ফুস্‌ফুস্‌।

(১)—শ্বাসনালী। (২)—উহার শাখা। (৩)—বায়ু-কোষ্ঠ।

শ্বাসনালীর শাখা-প্রশাখা এবং তাহাদের বায়ু-কোষ্ঠ সকল একটী পাতলা চামড়া দ্বারা আবৃত। এই চামড়াটী থোলের ন্যায়। আমাদের বক্ষের
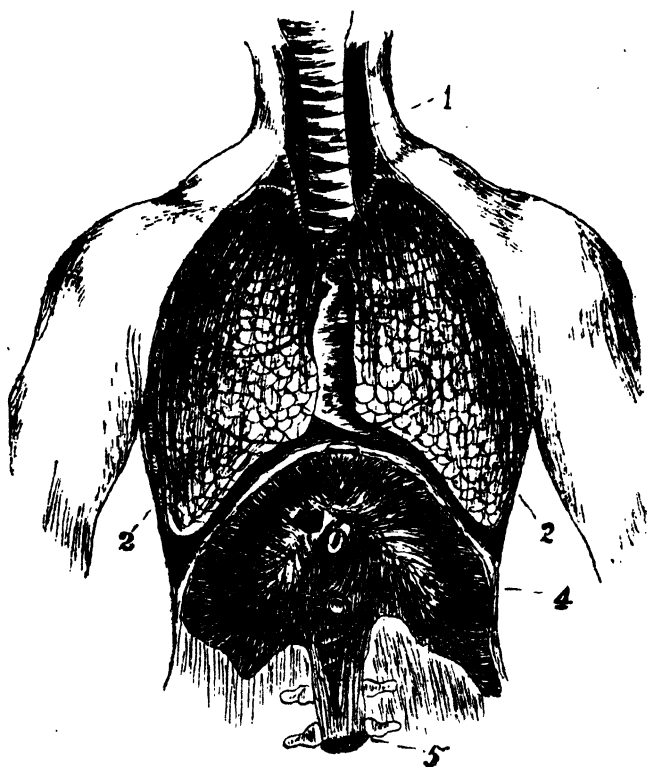
চিত্র ১৫।

১—শ্বাস-নালী। ২—ফুস্‌ফুস্‌। ৩—হৃৎপিণ্ড। ৪—ছত্রাকার মাংস-পেশী। ৫—মেরুদণ্ড।

দুইপার্শ্বে এইরূপ দুইটী থোলে আছে। এই থোলে দুইটীকে ফুস্‌ফুস্‌ বলে। ফুস্‌ফুসের রঙ্‌ রক্তাভ। ইহারা বক্ষের ভিতরের প্রায় সমস্তখানি জায়গাই

অধিকার করিয়া আছে। ফুস্‌ফুস্‌ হৃৎপিণ্ডকে প্রায় চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে।

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, দুইটী রক্ত-নালী দ্বারা শরীরের দূষিত রক্ত ফুস্‌ফুসে আইসে। এই দুইটী নালীর মধ্যে একটী বাম ফুস্‌ফুসে, ও অপরটী দক্ষিণ ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়াই অনেক ছোট ছোট শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই শাখাগুলি পুনরায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া চুলের মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্ত-নালী-রূপে ফুস্‌ফুসে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে।

এই সূক্ষ্ম রক্ত-নালীগুলি মিলিত হইয়া পুনরায় ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে এবং অবশেষে চারিটী বড় বড় নল হইয়া বিশুদ্ধ রক্তকে ফুস্‌ফুস্‌ হইতে হৃৎপিণ্ডে লইয়া যায়।

অতএব দেখিতেছ যে, ফুস্‌ফুস এক বায়ুর থোলের মত। ইহাতে অসংখ্য ছোট ছোট বায়ুর কোষ্ঠ আছে এবং ঐ বায়ুর কোষ্ঠের আবরণগুলি চতুর্দ্দিক্‌ হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য রক্ত-নালীদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে।

শ্বাস লইবার জন্যই ফুসফুস্‌ এবং শ্বাস-নালীর প্রয়োজন। যখন আমরা শ্বাস লই, তখন খানিক বায়ু নাসিকার অথবা মুখের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার পরে মুখ-গহ্বরের পশ্চাদ্দিক দিয়া শ্বাস-নালীতে যায়; শ্বাস-নালী-পথে ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যস্থিত সেই অসংখ্য বায়ু-কোষ্ঠগুলিকে বায়ু পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। ফুস্‌ফুসে এইরূপে বায়ু প্রবেশ করিলে উহা ফুলিয়া উঠে। তাহার পর যখন আমরা নিশ্বাস ত্যাগ করি, তখন ফুস্‌ফুসের সমস্ত বায়ু চাপ প্রভাবে বাহির হইয়া যায়। যেমন একটী ফুট্‌বলে হাওয়া পূরিলে ফুলিয়া উঠে এবং হাওয়া ছাড়িয়া দিলে উহা ছোট হইয়া যায়, আমাদের ফুস্‌ফুস্‌টীও সেইরূপ, নিশ্বাস লইলে ফুলিয়া উঠে এবং নিশ্বাস ত্যাগ করিলে ছোট হইয়া যায়। ইহা আমরা সর্ব্বদা নিশ্বাস-

প্রশ্বাসের সময় বেশ বুঝিতে পারি। ইহাকেই আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া বলিয়া থাকি।

এইবার কি প্রকারে বায়ু ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে এবং কি প্রকারে তাহা পুনরায় বাহির হইয়া যায়, তাহাই বলিব।

তোমরা জান যে, বক্ষের গহ্বর পাঁজরার হাড় দ্বারা বেষ্টিত এবং ঐ পাঁজরার হাড়গুলি সম্মুখে বক্ষের হাড়ের সহিত এবং পশ্চাতে মেরুদণ্ডের সহিত সংলগ্ন। এই পাঁজরার হাড়গুলির মধ্যে যে মাংস-পেশী আছে, তাহা অন্যান্য মাংস-পেশীর ন্যায় সঙ্কুচিত এবং প্রসারিত হইতে পারে। যখন এই মাংস-পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয়, তখন ইহারা নীচের পাঁজরার হাড়গুলিকে একটু উপরে টানিয়া লয়। অতএব ছোট পাঁজরা উপরে সরিয়া যায়, এবং তাহার নীচের বড় পাঁজরা তাহার স্থান অধিকার করে। এইরূপে বক্ষের পাশাপাশি দৈর্ঘ্য বাড়িয়া যায়।

পাঁজরার সম্মুখের সংযোগ-স্থানসকল উপরে সরিয়া যাইবার সময়ে বক্ষের হাড়কে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দেয়। ইহাতে বক্ষের পশ্চাৎ হইতে সম্মুখের দৈর্ঘ্য একটু বাড়িয়া যায়।

অতএব পাঁজরার মধ্যের পেশীসকল সঙ্কুচিত হইলে বক্ষের গহ্বর বড় হয়। আবার যখন এই পেশীসকল প্রসারিত হয়, তখন পাঁজরার হাড়গুলি পুনরায় নিজ নিজ স্থানে চলিয়া আইসে এবং বক্ষের গহ্বর ছোট হইয়া যায়।

বক্ষের গহ্বরের নীচের দিকে ফুস্‌ফুসের অব্যবহিত নিম্নদেশে একটী বড় অথচ পাতলা মাংস-পেশী আছে। ফুস্‌ফুসের দুই পার্শ্ব বক্ষের সহিত সংবদ্ধ, কিন্তু নীচের দিক্ এই মাংস-পেশীর সহিত সংলগ্ন আছে। এই মাংস-পেশী পাঁজরা, বক্ষের হাড় এবং মেরুদণ্ডের সহিত এমনভাবে সংলগ্ন যে, বক্ষের উপরের দিকে উঠিয়া উহা একটী খোলা ছাতার মত হইয়াছে। ইহা বক্ষঃকে উদর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া দিতেছে।

শরীরের অন্যান্য মাংস-পেশীর ন্যায় ইহাও সঙ্কুচিত হইতে পারে। যখন ইহা সঙ্কুচিত হয়, তখন ইহা নীচে চলিয়া আসিয়া চেপ্‌টা হইয়া যায়; ফলে, বক্ষের গহ্বর আয়তনে বড় হইয়া থাকে।

পুনরায় যখন এই পেশী প্রসারিত হইয়া উপরের দিকে চলিয়া যাইয়া নিজের স্বরূপ ( খোলা ছাতার আকার ) ধারণ করে, তখন বক্ষের গহ্বর আয়তনে ছোট হইয়া যায়।

এই পেশী সঙ্কুচিত হইয়া নীচের দিকে নামিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই, পাঁজরার মধ্যস্থিত পেশীসকলও সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করে। ফলে, বক্ষের গহ্বর চারিদিক হইতে এক সময়েই স্ফীত হইয়া উঠে।

এইরূপে বক্ষের গহ্বর স্ফীত হইলে, ফুস্‌ফুসের বাহিরে খানিকটা জায়গা খালি হইয়া পড়ে। কিন্তু ফুস্‌ফুস্‌ বক্ষের চারিদিকে এবং নীচে সংলগ্ন থাকাতে বক্ষের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গেই ফুস্‌ফুস্‌কে প্রসারিত হইতে হয় এবং সেই সঙ্গে খানিকটা বায়ু মুখ অথবা নাসিকার ছিদ্র এবং শ্বাস-নালী দিয়া ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে। প্রতি নিশ্বাসের সময় বায়ু এই প্রকারেই ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া থাকে।

খানিকটা বায়ু ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিলে, সেই ছাতার ন্যায় মাংস-পেশী এবং পাঁজরার মধ্যস্থিত মাংস-পেশী প্রসারিত হইয়া বক্ষের গহ্বরকে ছোট করিয়া দেয়। ছোট হইলে, এই মাংস-পেশীসকল ফুস্‌ফুস্‌কে চারিদিক্‌ হইতে চাপিয়া ধরে। সেই চাপের প্রভাবে ফুস্‌ফুসের বায়ু বাহির হইয়া যায়।

যদি এই ছাতার ন্যায় মাংস-পেশী এবং পাঁজরার মধ্যস্থিত মাংস-পেশীর সঙ্কোচ এবং প্রসারণ বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্বাসও বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহা হইলে মানুষ মরিয়া যায়। এই মাংস-পেশীগুলির সঙ্কোচ এবং প্রসারণ মিনিটে প্রায় সতের বার হয়, অর্থাৎ আমরা মিনিটে সতের বার নিশ্বাস লই এবং ত্যাগ করি। দিবা-রাত্রি এবং আমাদের

নিদ্রাকালেও এই পেশীগুলি নিজ নিজ কার্য্য করিতে থাকে। ইহারা আমাদের বশীভূত নহে। আমাদের ইচ্ছা থাকুক্, আর নাই থাকুক্, শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া হইতেই থাকে।

তোমরা ফুস্‌ফুসের কার্য্য দেখিলে। নিশ্বাস লইবার জন্যই ফুস্‌ফুসের সৃষ্টি। ফুস্‌ফুসের সাহায্যে আমরা কি প্রকারে নিশ্বাস গ্রহণ করি, তাহাও তোমরা দেখিলে। কিন্তু বলিতে পার কি, নিশ্বাস লইয়া আমাদের কি লাভ? নিশ্বাস-বায়ুদ্বারাই ফুস্‌ফুসের দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়।

ফুস্‌ফুসে দূষিত রক্ত কিরূপে পরিষ্কার হয় তাহা বলিবার পূর্ব্বে দেখা যাউক্ যে, যে বায়ু আমরা ফুস্‌ফুসে টানিয়া লই, ফুস্‌ফুসে যাইয়া তাহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় কি না।

তোমরা হয় ত ভাবিতে পার যে, যে বায়ু ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে এবং যে বায়ু ফুস্‌ফুস্ হইতে বাহির হইয়া আইসে, এই দুই বায়ুর মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু তাহা নহে, ঐ দুই বায়ুর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। নিম্নে ইহার কয়েকটী প্রমাণ দিতেছি।

১।—তুমি নিজের হাতের উপর নিশ্বাস ত্যাগ করিলে দেখিবে যে, ফুস্‌ফুস্ হইতে বহিরাগত নিশ্বাস-বায়ু বাহিরের বায়ু অপেক্ষা (যাহা তোমার ফুস্‌ফুসের মধ্যে প্রবেশ করে) অধিক গরম।

২।—কোন শীতল পদার্থের উপরে (যথা শ্লেট বা আয়না) কিছুক্ষণ নিশ্বাস ফেলিলে দেখিবে যে, উহার উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল-বিন্দু জমিয়া গিয়াছে।

৩।—একটী গ্লাসে চূণের জল লইয়া, একটী ফাঁপা নল (যথা পেঁপের ডাল অথবা বাঁশের নল) দ্বারা যদি তাহাতে কিছুক্ষণ ফুঁ দাও, তাহা হইলে পরিষ্কার চূণের জলে শাদা শাদা গুঁড়ো দেখা যাইবে ও জল ঘোলা হইয়া উঠিবে।

বাহিরের বায়ু যাহা আমরা ফুস্‌ফুসে টানিয়া লই, তাহার দ্বারা এইরূপ হয় না।

অতএব যে বায়ু আমাদের ফুস্‌ফুস্‌ হইতে বাহিরে আইসে এবং যে বায়ু আমরা ফুস্‌ফুসে টানিয়া লই, এই দুই বায়ু একপ্রকার নয়। ইহার দ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে যে, ফুস্‌ফুসে যে বায়ু প্রবেশ করে, তাহার তথায় পরিবর্ত্তন হয়। এই পরিবর্ত্তন কি এবং কেন হয়?

শরীরের নানা স্থান হইতে ফুস্‌ফুসে যে দূষিত রক্ত আইসে, নিশ্বাস-বায়ু ফুস্‌ফুসে যাইয়া তাহা হইতে দূষিত পদার্থ ( বাষ্প প্রভৃতি ) গ্রহণ করে। তৎপরে সেই বায়ু উক্ত দূষিত পদার্থ লইয়া বাহিরে আইসে। এই প্রকারে বায়ু ফুস্‌ফুসে যাইয়া পরিবর্ত্তিত হয়। এই পরিবর্ত্তনের বিষয় তোমরা পরে আরও কিছু জানিতে পারিবে।

যে বায়ু ফুস্‌ফুস্‌ হইতে বাহিরে আইসে, তাহাতে দূষিত পদার্থ থাকে বলিয়া তাহাকে দূষিত বায়ু বলা যাইতে পারে এবং যে বায়ু ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে, তাহাকে বিশুদ্ধ বায়ু বলা যাইতে পারে।

মোম-বাতি, কয়লা, কাগজ প্রভৃতি পোড়াইলে এইরূপ দূষিত বায়ু উৎপন্ন হয়।

এক টুক্‌রা কয়লা বা মোমবাতি বা কাগজ লইয়া উহাকে প্রায় ১৮ ইঞ্চ লম্বা একটী লোহার তারের অগ্রভাগে বাঁধ। তাহার পর কয়লাকে ভাল করিয়া জ্বালাইয়া বড় একটী কাঁচের গ্লাসের নীচে নামাইয়া দাও। কয়লা কয়েক মিনিট ধরিয়া গ্লাসের নীচে জ্বলিবার পর, উহাকে তুলিয়া লইয়া, গ্লাসের মধ্যে খানিকটা পরিষ্কার টাট্‌কা চূণের জল ঢালিয়া দাও। গ্লাস হাতে লইয়া খানিকক্ষণ নাড়িলে দেখিবে যে, পরিষ্কার চূণের জল দুগ্ধের মত ঘোলা হইয়া গিয়াছে।

ইহা হইতে কি প্রমাণ হয়? ইহা হইতে এই বুঝা যায় যে, যে প্রকার দূষিত বায়ু ফুস্‌ফুস্‌ হইতে বাহিরে আইসে, বাহিরের বিশুদ্ধ

বায়ুতে কতকগুলি পদার্থ পোড়াইলেও সেই প্রকার দূষিত বায়ু উৎপন্ন হয়।

এই দূষিত বায়ু আমাদের ফুস্‌ফুস্‌ হইতে ক্রমাগত বাহিরে আসিতেছে। ইহা হইতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, আমাদের শরীরের মধ্যেও একপ্রকার দাহ অনবরত হইতেছে। ধূম, অগ্নি-শিখা এবং উষ্ণতা দ্বারাই আমরা অগ্নির পরিচয় পাইয়া থাকি। আমাদের শরীরে ধূম বা অগ্নি-শিখা নাই বটে, কিন্তু উষ্ণতা আছে। আমাদের শরীর সর্ব্বদাই গরম থাকে, আমাদের নিশ্বাসও গরম। অতএব অনুমান দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের শরীরেও এক প্রকার মৃদু দাহ হইতেছে। সেই দাহ হেতু জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয় এবং তাহাই নিশ্বাসের সহিত বাহিরে আইসে। যদি তুমি জলন্ত প্রদীপ বা মোমবাতিকে এক কাঁচের গ্লাস দ্বারা এমন ভাবে ঢাকিয়া ফেল যে, বাহিরের বায়ু গ্লাসের ভিতর যাইতে না পারে, তাহা হইলে তুমি দেখিবে যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রদীপ বা মোমবাতি নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, বায়ু না থাকিলে প্রদীপ জ্বলিতে পারে না। আমরা যে বায়ু ফুস্‌ফুসে লই, সেই বায়ুর সাহায্যেই আমাদের শরীরের মধ্যে দাহ হইতেছে।

তাহা হইলে, বায়ু আমাদের শরীরের মধ্যে কি কি পদার্থ পোড়াইতেছে? মাংস-পেশীর ক্ষয়প্রাপ্ত অংশরূপ আবর্জ্জনাকে বায়ু ধীরে ধীরে অনবরত পোড়াইয়া ফেলিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনার জন্য আমাদের মাংস-পেশী নিত্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। মাংস ক্ষয় হইবার সময় দূষিত বায়ু ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে। শরীরের সর্ব্বত্র যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তনালী আছে, তাহাতে ঐ সকল ক্ষয়প্রাপ্ত মাংস, দূষিত বায়ু এবং জলীয় বাষ্প যাইয়া মিলিতেছে। এই সকল দূষিত পদার্থ মিশ্রিত হইলে বিশুদ্ধ লাল রক্ত দূষিত ও বেগুনি হইয়া যায়।

এইরূপে শরীরের সমস্ত দূষিত পদার্থ রক্তে যাইয়া পড়িতেছে। তাহা হইলে রক্তই আমাদের শরীরের সমস্ত আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিতেছে।

দূষিত বায়ু, ক্ষয়প্রাপ্ত মাংস, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি আবর্জ্জনা লইয়াই দূষিত রক্ত হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ দিকে আইসে। হৃৎপিণ্ড সেই রক্তকে চাপ দিয়া ফুস্‌ফুসে পাঠাইয়া দেয়। ফুস্‌ফুসে এই রক্ত আবর্জ্জনা-বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ ও লোহিতবর্ণ হয়। কি করিয়া হয় বলিতেছি, শুন।

যখন আমরা নিশ্বাস গ্রহণ করি, তখন খানিকটা বিশুদ্ধ বায়ু ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে। ফুস্‌ফুসে যাইয়া ঐ বায়ু ফুস্‌ফুসের বায়ু-কোষ্ঠে যায়। ঐ বায়ু-কোষ্ঠের আবরণগুলি চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য রক্ত-নালীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। বায়ু-কোষ্ঠের এবং এই সূক্ষ্ম রক্ত-নালীর আবরণ এত পাতলা যে, বায়ু তাহার ভিতর দিয়া যাইয়া রক্তকে স্পর্শ করিতে পারে। বায়ু সেই পাতলা আবরণ ভেদ করিয়া যাইয়া রক্তের সহিত মিলিত হয়, এবং রক্তের দূষিত অংশ লইয়া বায়ু-কোষ্ঠে ফিরিয়া আইসে। রক্ত হইতে দূষিত বায়ু প্রভৃতি নিরাকৃত হইলে উহা পুনরায় বিশুদ্ধ হইয়া লোহিতবর্ণ ধারণ করে।

যখন আমরা নিশ্বাস পরিত্যাগ করি, তখন দূষিত বায়ু প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ সেই বায়ু ফুস্‌ফুস্‌ হইতে বাহির হইয়া যায়। এইরূপ কার্য্য ক্রমাগত হইতেছে।

এই প্রকারে রক্ত নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সাহায্যে শরীরের আবর্জ্জনা অনবরত দূর করিতেছে।

শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া যাহাতে সহজে হইতে পারে, সে বিষয়ে তোমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কসা জামা, কসা গেঞ্জী, কোমরবন্ধ প্রভৃতি ব্যবহার করিলে বক্ষে ও উদরে চাপ পড়ে। এই চাপের জন্য নিশ্বাস লইবার সময় বক্ষ যথেষ্ট প্রসারিত হইতে পারে না। বক্ষঃ যথেষ্ট প্রসারিত না হইলে, ফুস্‌ফুসে যথেষ্ট বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। ফুস্‌ফুসে যথেষ্ট বায়ু প্রবেশ করিতে না পারিলে, দূষিত রক্তের আবর্জ্জনা সমস্ত বাহির হইয়া

যাইতে পারে না, কতক অংশ রক্তের মধ্যেই থাকিয়া যায়। রক্তের মধ্যে আবর্জ্জনা থাকিয়া গেলে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। অতএব কসা জামা, গেঞ্জী প্রভৃতি ব্যবহার করা উচিত নহে।

রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার সময়েও এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। কসা জামা বা গেঞ্জী পরিয়া ঘুমাইলে উপরে যাহা বলিলাম তাহা ত হইবেই, তদ্ভিন্ন কসা জামা পরিয়া আছ বলিয়া জোর করিয়া নিশ্বাস লইতে হইবে। জোর করিয়া নিশ্বাস লইতে হইলে, পরিশ্রম ও অস্বচ্ছন্দতা-হেতু সুনিদ্রা হইবে না। রাত্রিতে সুনিদ্রা না হইলে শরীরের অনিষ্ট হয়। অতএব রাত্রিতে জামা পরিয়া শুইতে হইলে ঢিলা জামা পরিধান করাই কর্ত্তব্য, কসা জামা কদাচ ব্যবহার করা উচিত নহে।

মুখ ও নাসিকা, উভয়ের সহিত শ্বাস-নালীর সংযোগ থাকায়, নিশ্বাস মুখ দ্বারাও লইতে পার, নাসিকা দ্বারাও লইতে পার। কিন্তু নিশ্বাস নাসিকা দ্বারা লওয়াই ভাল; কারণ মুখ দ্বারা নিশ্বাস লইলে বায়ুর সহিত মিশ্রিত ধুলা-বালি ইত্যাদির ফুস্‌ফুসে যাইবার সম্ভাবনা থাকে। এই ধুলা-বালি ফুস্‌ফুসে গেলে রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। নাসিকার মধ্যে অনেক লোম ও একপ্রকার জলীয় পদার্থ থাকে। নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস লইলে ধুলা-বালি ঐ লোম এবং জলীয় পদার্থে আট্‌কাইয়া যায়, ফুস্‌ফুসের ভিতর যাইতে পারে না। এই জন্য নাসিকা দ্বারাই নিশ্বাস লওয়া উচিত।

নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস লইবার আরও এক উপকারিতা আছে। নাসিকার অভ্যন্তর ভাগ গরম। নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস লইলে, বায়ু গরম হইয়া ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে। কিন্তু মুখ দ্বারা নিশ্বাস লইলে, বায়ু ততটা গরম হইবার অবকাশ পায় না। সহসা শীতল বায়ু ফুস্‌ফুসে গেলে (বিশেষতঃ শীতকালে) সর্দ্দি, কাশি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে।

**বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা।** তোমরা হয় ত ভাবিতে পার যে, যে কোন বায়ুই ফুস্‌ফুসে গেলে রক্ত পরিষ্কার হয়। কিন্তু প্রকৃত-

পক্ষে তাহা হয় না। কেবল বিশুদ্ধ বায়ুই ফুস্‌ফুসে যাইলে রক্ত পরিষ্কার হয়। দূষিত বায়ু ফুস্‌ফুসে যাইলে রক্ত পরিষ্কার হওয়া দূরে থাকুক বরং উহা রক্তকে আরও দূষিত করিয়া দেয়। ইহার ফলে স্বাস্থ্যহানি হয়। খোলা মাঠ, বাগান, নদী, সমুদ্রের তীর প্রভৃতি স্থানের বায়ু বিশুদ্ধ। পর্ব্বতের চূড়াতে এবং সমুদ্রের বক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া যায়। জনাকীর্ণ স্থানের বায়ু প্রায়ই দূষিত হইয়া থাকে ; দুর্গন্ধপূর্ণ বায়ুও দূষিত। প্রত্যহ খোলা জায়গায় বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

তোমাদের ঘরের বায়ু যাহাতে সব সময় বিশুদ্ধ থাকে সে বিষয়ে তোমাদের বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখা উচিত। পূর্ব্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, সাধারণতঃ আমরা মিনিটে সতের বার নিশ্বাস লইয়া থাকি। তোমাদিগকে ইহাও বলিয়াছি যে, আমাদের ফুস্‌ফুস্ হইতে যে বায়ু বাহিরে আইসে তাহা দূষিত এবং শরীরের আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। অতএব, তোমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, প্রতি মিনিটে আমাদের ফুস্‌ফুস্ হইতে আবর্জ্জনাপূর্ণ দূষিত বায়ু বাহির হইয়া বাহিরের বায়ুকেও ক্রমশঃ দূষিত করিয়া দিতেছে।

তুমি যদি তোমার পড়িবার বা শুইবার ঘরের সমস্ত দরজা ও জানালা বন্ধ করিয়া দাও, তাহা হইলে বাহির হইতে বিশুদ্ধ বায়ু ঘরের ভিতর আসিতে পারিবে না। ঘরের মধ্যে যতটুকু বিশুদ্ধ বায়ু আছে তাহা ক্রমাগত নিশ্বাস লইয়া ফুরাইয়া যাইবে এবং শীঘ্রই ঘর নিশ্বাসের দূষিত বায়ুতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। তখন নিশ্বাসের সহিত এই দূষিত বায়ু তোমার ফুস্‌ফুসে যাইতে থাকিবে। তাহা হইলে তোমার রক্ত ত পরিষ্কার হইবেই না, বরং দূষিত বায়ু অনবরত তোমার ফুস্‌ফুসে যাইয়া তোমার রক্তের সঙ্গে মিশিয়া তোমার রক্তকে আরও দূষিত করিয়া দিবে। ইহার ফলে তোমার মাথা ধরিবে, এবং তুমি ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে ; তখন কোনও কাজ করিতে তোমার ভাল লাগিবে না।

প্রত্যহ অধিকক্ষণ ধরিয়া এইরূপ দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ঘরে থাকিলে অবশেষে একটা কঠিন রোগ (যথা যক্ষ্মা) হইয়া পড়িতে পারে। বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে সহসা মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। অন্ধকূপ-হত্যার কথা পড়িয়াছ ত? বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে এক রাত্রিতে ১৪৬ জনের মধ্যে ১২৩ জন লোক মরিয়া গিয়াছিল!

অতএব তোমরা শুইবার, বসিবার বা পড়িবার ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া রাখিবে। কি শীতকালে, কি গ্রীষ্মকালে, দরজা জানালা বন্ধ করিয়া কোন ঘরে থাকিবে না। শীতকালে দরজা জানালা না হয় অল্প খুলিয়া রাখিবে। রোগীর ঘরেও দরজা জানালা এক-একটু খোলা রাখা দরকার। রোগীর পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু একান্ত আবশ্যক, এইজন্য ডাক্তারেরা অনেক রোগীকে পাহাড়ে কিম্বা সমুদ্রতীরে কিছুকাল বাস করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

যেমন বিশুদ্ধ বায়ুর ঘরে আসা দরকার, তেমনি নিশ্বাস দ্বারা দূষিত বায়ুরও ঘর হইতে দূর হইয়া যাওয়া চাই। তোমাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নিশ্বাস-বায়ু গরম। গরম বায়ু শীতল বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা হওয়াতে ঊর্দ্ধে উঠে। যেমন আগুনের চারিদিকের বায়ু বা ধোঁয়া গরম হইয়া ঊর্দ্ধে উঠে ইহাও ঠিক সেইরূপ। অতএব নিশ্বাস-বায়ু ছাদের দিকে উঠে। যদি ছাদের নিকটে কোন ছিদ্র থাকে, তাহা হইলে সেই পথ দিয়া দূষিত, গরম নিশ্বাস-বায়ু ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবে। অতএব ঘরের ছাদের নিকট কোন প্রকার ছিদ্র থাকা উচিত। এইজন্যই ছাদের অল্প নীচে ছোট জানালা বা গবাক্ষ রাখা হয়। দরজা জানালা দ্বারা ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে এবং দূষিত বায়ু এই জানালা বা গবাক্ষ দ্বারা বাহির হইয়া যায়।

ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া রাখিলেও কদাচ লেপ ইত্যাদি দ্বারা মুখ ঢাকিয়া শুইবে না, নচেৎ তোমার নিশ্বাস দ্বারা দূষিত বায়ু তোমারই ফুস্‌ফুসে ক্রমাগত প্রবেশ করিতে থাকিবে। এই বিষয়ে জননীগণের বিশেষ

সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। মশা, মাছি প্রভৃতি কামড়াইয়া যাহাতে শিশুর নিদ্রাভঙ্গ করিতে না পারে এজন্য অনেকে স্বীয় শিশুসন্তানগণের মুখ নিদ্রিতাবস্থায় ঢাকিয়া রাখেন; এরূপ করা নিতান্ত অন্যায়। মাছি, মশা প্রভৃতির উপদ্রব নিবারণের জন্য ছোট মশারি ব্যবহার করা উচিত্। কিন্তু কখনও মুখ ঢাকিয়া রাখা উচিত নয়। দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ যদি লেপ বা চাদর কোনও প্রকারে শিশুর শরীরের সহিত জড়াইয়া বাহিরের বায়ু প্রবেশের পথ বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে ফুসফুসে ক্রমাগত দূষিত বায়ু প্রবেশ করাতে শিশুটী অচৈতন্য হইয়া যাইতে পারে; এমন কি তাহার প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে।

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

## খাদ্য ও তাহার পরিপাক।

তোমাদিগকে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-চালনা-হেতু আমাদের শরীরের মাংস ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তোমরা পড়িয়াছ যে, এই ক্ষয়প্রাপ্ত মাংস পুড়িয়া দূষিত বায়ু উৎপন্ন হইতেছে এবং রক্ত ফুস্‌ফুসে যাইয়া সেই বায়ুকে শরীর হইতে দূর করিয়া দিতেছে।

রক্ত-সঞ্চালন বর্ণনা করিবার সময় তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, রক্ত খাদ্য হইতে মাংস-উৎপাদক সামগ্রী লইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত মাংসের স্থানে নূতন মাংস প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। রক্ত কি করিয়া খাদ্য হইতে মাংস-উৎপাদক পদার্থ গ্রহণ করে, তাহা এই পরিচ্ছেদে বলিব।

আমাদের খাদ্যের মধ্যে অধিকাংশই কঠিন ( solid ) পদার্থ। কঠিন পদার্থ পাকস্থলীর রক্ত-নালীর আবরণ দিয়া রক্তে মিশিতে পারে না ; খুব তরল হইলে মিশিতে পারে। পাকস্থলীতে প্রথম খাদ্য হইতে শরীর-গঠনোপযোগী বা পুষ্টিকর সামগ্রী, অপুষ্টিকর সামগ্রী হইতে পৃথক্ হয়, তাহার পর উহা তরল হয়। তখন উহা পাকস্থলীস্থিত সেই চুলের মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্ত-নালীর রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহাকেই সাধারণতঃ পরিপাক-ক্রিয়া ( digestion ) বলে। খাদ্য কি প্রকারে পরিপাক হয়, তাহা তোমরা এই পরিচ্ছেদে বুঝিতে পারিবে।

মনে কর, তুমি ভাত বা রুটি, মাছ বা মাংস, ডাল, ঘী এবং আলুর তরকারী খাইতেছ।

অনেকে মনে করিয়া থাকে, পরিপাক-কার্য্য কেবল মাত্র পাকস্থলীতে হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা নহে। পরিপাক-কার্য্য মুখ হইতে আরম্ভ হয়। দন্ত যাঁতার কার্য্য করে। দন্ত জিহ্বার সাহায্যে খাদ্যদ্রব্যকে চূর্ণ করে। সেই চূর্ণের সহিত মুখের লালা ( saliva ) মিশ্রিত হইয়া খাদ্য নরম ও তরল হয়।

মুখের মধ্যে ছয়টী লালার থোলে আছে। উহা হইতে সর্ব্বদা লালা বাহির হইয়া মুখাভ্যন্তরকে সিক্ত রাখে। মুখে খাদ্যদ্রব্য দিলে অধিক পরিমাণে লালা নিঃসৃত হয়।

খাদ্যদ্রব্যকে দন্তের নিম্নে লইয়া যাওয়া এবং উত্তমরূপে চূর্ণ হইলে তাহা মুখের পশ্চাতের ছিদ্র দিয়া পাকস্থলীর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া, ইহাই জিহ্বার কার্য্য।

দন্ত এবং জিহ্বার সাহায্যে খাদ্য উত্তমরূপে চূর্ণ হইলে, তাহার সহিত লালা মিশ্রিত হইয়া খাদ্যের কিয়দংশ তরল হয়। লালা ভাত, রুটি ও আলুর অধিকাংশকেই অনেকটা তরল করিতে পারে, কিন্তু মাছ, মাংস, ডাল, ঘী, মাখন প্রভৃতি পদার্থকে প্রায় তরল করিতে পারে না। অতএব তুমি, যে ভাত, রুটি এবং আলু খাইলে, তাহার অধিকাংশ মুখের মধ্যেই তরল হইল। তখন মুখের মধ্যে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্ত-নালী আছে তাহারা তাহার যতটুকু পারে তৎক্ষণাৎ চুষিয়া লইবে।

অবশিষ্ট খাদ্যকে (মাছ, মাংস, ডাল, ঘী এবং রুটি, ভাত ও আলুর যে অংশ তখনও তরল হয় নাই, তাহাকে ) জিহ্বা মুখ-গহ্বরের পশ্চাতের ছিদ্র দিয়া পাকস্থলীতে প্রেরণ করে। প্রায় ৯ ইঞ্চ লম্বা এক নল দিয়া খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। এই নালীকে "খাদ্য-নালী" বলা যাইতে পারে।

তোমার কোন বন্ধুকে হাঁ করিতে বল। সে হাঁ করিলে, তুমি তাহার

মুখের মধ্যে দৃষ্টিপাত কর। দেখিবে যে, তাহার মুখের মধ্যে দুইটী ছিদ্র আছে, একটী সম্মুখে ও অপরটী পশ্চাতে। সম্মুখের ছিদ্রটী ছোট এবং পশ্চাতের ছিদ্রটী বড়। ছোট ছিদ্রটী শ্বাস-নালীর দ্বার এবং বড় ছিদ্রটী খাদ্য-নালীর দ্বার।

আচ্ছা, বল দেখি, এই দুইটী ছিদ্র এত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও, খাদ্য কেন খাদ্য-নালী দিয়াই যায়, কখনও শ্বাস-নালীতে প্রবেশ করে না?

চতুর্দ্দশ অথবা সপ্তদশ চিত্রের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর; অথবা তোমার বন্ধুর মুখের ভিতর দেখ। দেখিবে যে, শ্বাস-নালীর দ্বারে মাংসপেশীর একটী ছোট ঢাকনী আছে। আমরা উহাকে আল্‌জিব বলিয়া থাকি। যখন খাদ্য শ্বাস-নালীর উপর দিয়া পশ্চাতে খাদ্য-নালীর দিকে যায়, তখন ঐ আল্‌জিব শ্বাস-নালীর ছিদ্রকে বন্ধ করিয়া দেয়। তাই খাদ্য শ্বাস-নালীতে বা ফুস্‌ফুসে যাইতে পারে না। খাদ্য আল্‌জিবের উপর দিয়া চলিয়া গেলে, আল্‌জিব আবার শ্বাস-নালীর দ্বার খুলিয়া দেয়। তাহা না হইলে আমরা শ্বাস লইব কি করিয়া? আল্‌জিব যদি শ্বাস-নালীর দ্বার বন্ধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে বায়ু ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিতে পারে না।

আহার করিতে করিতে নিশ্চয় কখন তোমার 'বিষম' লাগিয়া থাকিবে। 'বিষম' লাগিলে আমাদিগকে কেমন অস্থির হইতে হয়—হাঁপাইতে থাকি, হাঁচিতে ও কাশিতে থাকি, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আইসে। তোমার মাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, যে 'বিষম খাওয়া' কি, তাহা হইলে তিনি সম্ভবতঃ বলিবেন যে, খাদ্য বা জল "তালুতে উঠিয়াছে"। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটী কি শুনিবে? আহার গ্রহণ কালে, হঠাৎ একটুক্‌রা খাদ্য শ্বাস-নালীর প্রহরী আল্‌জিবকে ফাঁকি দিয়া শ্বাস-নালীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বসে। তখন শ্বাস-নালীর ছিদ্র খানিকটা বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং আমাদের শ্বাস গ্রহণে কষ্ট হয়। তজ্জন্যই আমরা হাঁচিতে থাকি এবং মনে করি যে, দম বন্ধ হইয়া আসিল। কিন্তু হাঁচি কেন? ফুস্‌ফুসের মধ্যে যে বায়ু থাকে,

তাহা এক সঙ্গে খুব জোরে শ্বাস-নালী দিয়া বাহির হইয়া সেই অনর্থকারী খাদ্যের টুক্‌রাকে বাহির করিয়া দিতে চেষ্টা করে। হাঁচি না পাইলে আমরা এইজন্য সময়ে সময়ে নাকে খড়্‌কে দিয়া হাঁচিয়া থাকি। হাঁচির সহিত খাদ্যের টুক্‌রা বাহির হইয়া গেলে তবে আমরা আরাম পাই। এইজন্য বলিতেছি যে, মুখে খাদ্য লইয়া কথা বলা অথবা হাস্য করা উচিত নয়।

তোমরা হয় ত মনে করিতে পার যে, যেমনভাবে জল উপর হইতে নালী দিয়া সোজা নীচে পড়ে, খাদ্যও সেইভাবে খাদ্য-নালী দিয়া পাকস্থলীতে যাইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা নহে। যদি তাহা হইত, তবে শুইয়া আমরা কিছুই গিলিতে পারিতাম না। খাদ্য-নালী আংটীর মত কতকগুলি গোলাকার দৃঢ় মাংস-পেশী দ্বারা বেষ্টিত আছে। খাদ্য-নালীর মুখে খাদ্য আসিলেই, খাদ্য-নালীর প্রথম মাংস-পেশী সঙ্কুচিত হইয়া, চাপ দিয়া খাদ্যকে একটু নীচে ঠেলিয়া দেয়, তাহার পরে ঐরূপে দ্বিতীয় মাংস-পেশীও সঙ্কুচিত হইয়া, চাপ দিয়া খাদ্যকে আরও একটু নীচে পাঠাইয়া দেয়। এইরূপ করিতে করিতে খাদ্য অবশেষে পাকস্থলীতে যাইয়া পড়ে।

পাকস্থলী বা আমাশয় একটী বড় থোলের মত। ইহাতে প্রায় দুই সের পরিমাণ জল ধরে। ইহার অধিকাংশ ফুস্‌ফুসের নীচে বাম দিকে অবস্থিত। ( চিত্র ১৬ )

পাকস্থলী মাংস-পেশী দ্বারা নির্ম্মিত। এই মাংস-পেশী, হৃৎপিণ্ডের মাংস-পেশীর ন্যায়, আপনা হইতেই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে। ইহা আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। পাকস্থলীর ভিতর দিকে সর্ব্বত্র অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসপূর্ণ থোলে ( gland ) আছে। যেমন লালা বাহির হইয়া মুখ-মধ্যস্থিত খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয়, পাকস্থলীতেও খাদ্য আসিলে সেইরূপ এই থোলেগুলি-হইতে রস বাহির হইয়া খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়।

পাকস্থলীতে খাদ্য প্রবেশ করিবামাত্র ইহার একদিকের মাংস-পেশী সঙ্কুচিত হইয়া চাপ দিয়া খাদ্যকে অন্যদিকে প্রেরণ করে। তখন অপরদিকের
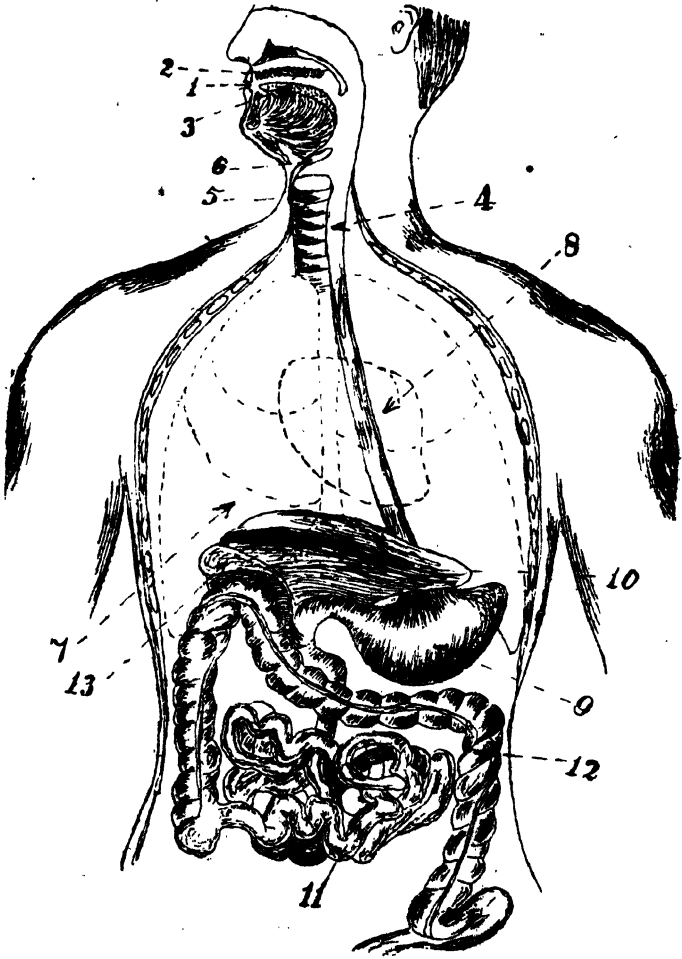
চিত্র ১৬। পাকস্থলী বা আমাশয়।

১—মুখ। ২—দাঁত। ৩—জিহ্বা। ৪—খাদ্য-নালী। ৫—শ্বাস-নালী। ৬—আলজিব। ৭—ফুস্‌ফুস্।

মাংস-পেশী সঙ্কুচিত হইয়া, চাপ দিয়া খাদ্যকে আবার সেই প্রথমদিকে ঠেলিয়া দেয়। এইরূপে খাদ্য ক্রমাগত সঞ্চালিত হইতে থাকে। ফলে, হাত দিয়া ভাতকে ক্রমাগত চট্‌কাইলে যেমন হয়, পাকস্থলীর ভিতরেও খাদ্য সেইরূপ হয়।

পাকস্থলীর রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া এবং ক্রমাগত সঞ্চালিত ও চূর্ণ হইয়া খাদ্যদ্রব্য অবশেষে মণ্ডের মত তরল হয়। তখন তাহার রঙ্ কতকটা হলুদের ন্যায় হইয়া যায়।

তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মুখের লালা রুটি, ভাত এবং তরকারীর অধিকাংশ ভাগকেই তরল করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু মাছ, মাংস, ডিম, ডাল কিম্বা ঘীকে তরল করিতে পারে না। ঘী, তেল, মাখন প্রভৃতি ব্যতীত ইহাদের অধিকাংশকেই পাকস্থলীর রস তরল করিয়া ফেলে। তরল হইলে, পাকস্থলীতে যে অসংখ্য চুলের মত পাতলা রক্ত-নালী আছে, তন্মধ্যস্থিত রক্ত তখন সেই তরল খাদ্যকে চুষিয়া লইয়া, সত্বর ছুটিয়া যাইয়া শরীরের সর্ব্বত্র বিলাইয়া দেয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত মাংস-পেশীর অভাব পূর্ণ করে।

মণ্ডের ন্যায় খাদ্যাবশিষ্ট যাহা পাকস্থলীতে রহিল, তাহার অধিকাংশই ঘী, তৈলময় পদার্থ এবং ভাত, রুটি, তরকারী, মাছ, মাংস ও ডালের কঠিন অংশ। ইহার তখনও এমন অবস্থা হয় নাই যে, রক্ত-নালী ইহাকে চুষিয়া লইতে পারে। তজ্জন্য, ইহা পাকস্থলী হইতে **অন্ত্রে** প্রবেশ করে। সেখানে ইহা আরও চূর্ণ হইয়া তরল হইতে থাকে। কি করিয়া হয়, বলিতেছি শুন।

প্রথমে অন্ত্র কি তাহা জানিয়া লও। অন্ত্র একটী প্রকাণ্ড বা বৃহৎ নালী। (চিত্র ১৬)। ইহা পাকস্থলীর দক্ষিণদিক হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দৈর্ঘ্যে ইহা শরীরের প্রায় পাঁচগুণ, অর্থাৎ প্রায় ২৬ ফুট। ইহার দুই ভাগ আছে। প্রথম বা উপরের ভাগ, দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০ ফুট, এবং ইহার

ছিদ্রের ব্যাস প্রায় ১॥০ ইঞ্চ হইবে। দ্বিতীয় বা নীচের ভাগ, দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬ ফুট, এবং ইহার ব্যাস প্রায় ৩ ইঞ্চ।

অন্ত্রের উপরের ভাগকে "ক্ষুদ্র অন্ত্র" এবং নীচের ভাগ মোটা বলিয়া উহাকে "বৃহৎ অন্ত্র" বলা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র অন্ত্র পাকস্থলীর নিম্নে সর্পের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া আছে; সেইজন্য এত বড় নলটী থাকিতে বেশী স্থানের প্রয়োজন হয় না। (চিত্র ১৬)। বৃহৎ অন্ত্র প্রথমে উপরে পাকস্থলীর দিকে উঠিয়া দক্ষিণদিকে গিয়াছে, তাহার পর পাকস্থলীর নীচে দিয়া বামদিকে গিয়াছে; তাহার পর নীচে নামিয়া মল-দ্বারে আসিয়াছে। (চিত্র ১৬)

খাদ্য-নালীর ন্যায়, অন্ত্রের ভিতরেও মাংস-পেশী আছে। এই মাংস-পেশীগুলি আপনা হইতেই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। পাকস্থলী বা মুখের ন্যায় অন্ত্রের মধ্যেও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসের থোলে ( gland ) আছে।

এখন একবার ষোড়শ চিত্রের দিকে দেখ। পাকস্থলীর উপরে, দক্ষিণদিকে বড় মেটে রঙ্গের একটা পদার্থ আছে। ইহাকে আমরা **যকৃৎ** বলি। যকৃৎ অন্ত্রের মধ্যে একপ্রকার রস ঢালিয়া দিয়া থাকে। এই রসকে **পিত্তরস** বলে। পিত্ত প্রধানতঃ ঘী, তৈল এবং খাদ্যসামগ্রীমধ্যস্থ তৈলাক্ত পদার্থের ছোট ছোট কণাকে আরও তরল করিয়া দেয়। যখন যকৃতের এই রসের (পিত্তের) প্রয়োজন হয় না, তখন উহা এক থোলের মধ্যে জমা থাকে। পিত্তের এই থোলেকে **পিত্তকোষ** বলে।

পাকস্থলীর পশ্চাতে আরও একটী রসের থোলে আছে, তাহা চিত্রে দেখান হয় নাই। ইহা হইতেও একপ্রকার রস বাহির হইয়া, অন্ত্রের মধ্যে যাইয়া খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। পিত্তরসের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। পিত্তও ভাত, ডাল, রুটি, তরকারী, মাছ, মাংস, ঘী প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রীর যে অংশকে পরিপাক বা হজম করিতে ( অর্থাৎ তরল করিয়া রক্ত-নালীর চুষিয়া লইবার উপযোগী করিতে ) পারে নাই, এই রস সেই অংশের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে।

মাংস-পেশী সঙ্কুচিত হইয়া, চাপ দিয়া খাদ্যকে আবার সেই প্রথমদিকে ঠেলিয়া দেয়। এইরূপে খাদ্য ক্রমাগত সঞ্চালিত হইতে থাকে। ফলে, হাত দিয়া ভাতকে ক্রমাগত চট্‌কাইলে যেমন হয়, পাকস্থলীর ভিতরেও খাদ্য সেইরূপ হয়।

পাকস্থলীর রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া এবং ক্রমাগত সঞ্চালিত ও চূর্ণ হইয়া খাদ্যদ্রব্য অবশেষে মণ্ডের মত তরল হয়। তখন তাহার রঙ্ কতকটা হলুদের ন্যায় হইয়া যায়।

তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মুখের লালা রুটি, ভাত এবং তরকারীর অধিকাংশ ভাগকেই তরল করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু মাছ, মাংস, ডিম, ডাল কিম্বা ঘীকে তরল করিতে পারে না। ঘী, তেল, মাখন প্রভৃতি ব্যতীত ইহাদের অধিকাংশকেই পাকস্থলীর রস তরল করিয়া ফেলে। তরল হইলে, পাকস্থলীতে যে অসংখ্য চুলের মত পাতলা রক্ত-নালী আছে, তন্মধ্যস্থিত রক্ত তখন সেই তরল খাদ্যকে চুষিয়া লইয়া, সত্বর ছুটিয়া যাইয়া শরীরের সর্ব্বত্র বিলাইয়া দেয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত মাংস-পেশীর অভাব পূর্ণ করে।

মণ্ডের ন্যায় খাদ্যাবশিষ্ট যাহা পাকস্থলীতে রহিল, তাহার অধিকাংশই ঘী, তৈলময় পদার্থ এবং ভাত, রুটি, তরকারী, মাছ, মাংস ও ডালের কঠিন অংশ। ইহার তখনও এমন অবস্থা হয় নাই যে, রক্ত-নালী ইহাকে চুষিয়া লইতে পারে। তজ্জন্য, ইহা পাকস্থলী হইতে **অন্ত্রে** প্রবেশ করে। সেখানে ইহা আরও চূর্ণ হইয়া তরল হইতে থাকে। কি করিয়া হয়, বলিতেছি শুন।

প্রথমে অন্ত্র কি তাহা জানিয়া লও। অন্ত্র একটী প্রকাণ্ড বা বৃহৎ নালী। (চিত্র ১৬)। ইহা পাকস্থলীর দক্ষিণদিক হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দৈর্ঘ্যে ইহা শরীরের প্রায় পাঁচগুণ, অর্থাৎ প্রায় ২৬ ফুট। ইহার দুই ভাগ আছে। প্রথম বা উপরের ভাগ, দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০ ফুট, এবং ইহার

ছিদ্রের ব্যাস প্রায় ১॥০ ইঞ্চ হইবে। দ্বিতীয় বা নীচের ভাগ, দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬ ফুট, এবং ইহার ব্যাস প্রায় ৩ ইঞ্চ।

অন্ত্রের উপরের ভাগকে "ক্ষুদ্র অন্ত্র" এবং নীচের ভাগ মোটা বলিয়া উহাকে "বৃহৎ অন্ত্র" বলা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র অন্ত্র পাকস্থলীর নিম্নে সর্পের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া আছে; সেইজন্য এত বড় নলটী থাকিতে বেশী স্থানের প্রয়োজন হয় না। (চিত্র ১৬)। বৃহৎ অন্ত্র প্রথমে উপরে পাকস্থলীর দিকে উঠিয়া দক্ষিণদিকে গিয়াছে, তাহার পর পাকস্থলীর নীচে দিয়া বামদিকে গিয়াছে; তাহার পর নীচে নামিয়া মল-দ্বারে আসিয়াছে। (চিত্র ১৬)

খাদ্য-নালীর ন্যায়, অন্ত্রের ভিতরেও মাংস-পেশী আছে। এই মাংস-পেশীগুলি আপনা হইতেই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। পাকস্থলী বা মুখের ন্যায় অন্ত্রের মধ্যেও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসের থোলে ( gland ) আছে।

এখন একবার ষোড়শ চিত্রের দিকে দেখ। পাকস্থলীর উপরে, দক্ষিণদিকে বড় মেটে রঙ্গের একটা পদার্থ আছে। ইহাকে আমরা **যকৃৎ** বলি। যকৃৎ অন্ত্রের মধ্যে একপ্রকার রস ঢালিয়া দিয়া থাকে। এই রসকে **পিত্তরস** বলে। পিত্ত প্রধানতঃ ঘী, তৈল এবং খাদ্যসামগ্রীমধ্যস্থ তৈলাক্ত পদার্থের ছোট ছোট কণাকে আরও তরল করিয়া দেয়। যখন যকৃতের এই রসের (পিত্তের) প্রয়োজন হয় না, তখন উহা এক থোলের মধ্যে জমা থাকে। পিত্তের এই থোলেকে **পিত্তকোষ** বলে।

পাকস্থলীর পশ্চাতে আরও একটী রসের থোলে আছে, তাহা চিত্রে দেখান হয় নাই। ইহা হইতেও একপ্রকার রস বাহির হইয়া, অন্ত্রের মধ্যে যাইয়া খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। পিত্তরসের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। পিত্তও ভাত, ডাল, রুটি, তরকারী, মাছ, মাংস, ঘী প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রীর যে অংশকে পরিপাক বা হজম করিতে ( অর্থাৎ তরল করিয়া রক্ত-নালীর চুষিয়া লইবার উপযোগী করিতে ) পারে নাই, এই রস সেই অংশের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে।

খাদ্যের উপর এই দুই প্রকার রসের ক্রিয়া হইলে, খাদ্যদ্রব্য অতিশয় তরল হয়। তখন উহার রঙ্ দুধের ন্যায় শাদা হয়।

খাদ্য-নালীর মাংস-পেশীসকলের সঙ্কোচ-হেতু খাদ্য যেরূপে পাকস্থলীতে আসিয়া পড়ে, ঠিক্ সেইরূপে অন্ত্রস্থিত মাংস-পেশীর সঙ্কোচ দ্বারা এই শ্বেতবর্ণ পদার্থ অন্ত্রের মধ্যে ধীরে ধীরে চালিত হইতে থাকে। তখন অন্ত্রস্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্ত-নালী এই তরল খাদ্য হইতে পুষ্টিকর সামগ্রী ক্রমাগত চুষিয়া লইতে থাকে।

পাকস্থলী হইতে যেমন একপ্রকার রস বাহির হইয়া খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয়, তেমনি অন্ত্র হইতেও একপ্রকার রস বাহির হইয়া খাদ্যসামগ্রীর সহিত মিশ্রিত হইতে থাকে। খাদ্যদ্রব্যের যে অবশিষ্ট অংশকে উপরি-উক্ত দুইটী রসও তরল করিতে পারে নাই, এই অন্ত্রের রস তাহা তরল করিয়া ফেলে, অবশিষ্ট তরল অংশ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিতে পৌঁছিতে রক্ত-নালী সকল তাহা হইতে সমস্ত তরল পুষ্টিকর সামগ্রী চুষিয়া লয়। খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ তখন তরল থাকে না; অনেকটা শক্ত বা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে শরীর-গঠনোপযোগী বা পুষ্টিকর পদার্থ কিছুই থাকে না, খানিকটা দুষ্পাচ্য দ্রব্যমাত্র থাকে। ইহা মলদ্বার দিয়া এক বা দুইবার মলের আকারে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়।

এই প্রকারে রক্ত-নালীসকল খাদ্যদ্রব্য হইতে শরীর-গঠনোপযোগী সামগ্রী চুষিয়া লইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বিতরণ করিয়া দেয়।

পরিপাক-বিষয়ে উপরে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে তোমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে, খাদ্য ভাল করিয়া না চিবাইয়া গিলিয়া ফেলা উচিত নয়। যদি খাদ্য ভাল করিয়া না চিবাইয়া গিলিয়া ফেল, তাহা হইলে উহা মুখের মধ্যে চূর্ণ না হওয়াতে উহার সহিত লালা মিশ্রিত হইতে পারে না, সুতরাং উহা উত্তমরূপে তরল হইতে পারে না; চূর্ণ ও তরল না হইয়াই

খাদ্য পাকস্থলীতে যাইয়া পড়ে। এইজন্য পাকস্থলীকে দন্তের কার্য্যটাও করিতে হয়। ইহাতে পাকস্থলীর কার্য্য বাড়িয়া যায়। সুতরাং পাকস্থলী এতটা কার্য্য উত্তমরূপে করিয়া উঠিতে পারে না এবং অন্ত্রের দ্বারাও এ কার্য্য সাধিত হয় না। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ না হওয়াতে, রক্ত-নালী তাহা হইতে পুষ্টিকর সামগ্রী চুষিয়া লইতে পারে না। এইজন্য খাদ্যদ্রব্যের অধিকাংশ শরীরের কোন কার্য্যে না আসিয়া, তরল অবস্থাতেই বাহির হইয়া যায়। চলিত কথায় ইহাকে "পেটের অসুখ হওয়া" বলে। অতএব দেখ, উত্তমরূপে চিবাইয়া না খাইলে, আহারের দ্বারা তোমার শরীরের বিশেষ কোন উপকার ত হইবেই না, বরং পেটের অসুখও হইতে পারে। অত্যধিক আহারেও এইরূপেই পেটের অসুখ হইয়া থাকে।

পেটের অসুখ হইলেই তোমার শরীর দুর্ব্বল হইবে। তাহার কারণ এই যে, খাদ্যদ্রব্য অধিক হওয়াতে এবং উত্তমরূপে চূর্ণ না হওয়াতে, রক্ত-নালী উহা হইতে পুষ্টিকর সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে চুষিয়া লইয়া শরীরের সর্ব্বত্র বিতরণ করিতে পারে না, সুতরাং ক্ষয়প্রাপ্ত মাংস-পেশীর অভাবও পূরণ হয় না। এই হেতু তুমি দুর্ব্বল হইয়া যাও।

যদি তুমি সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে আহার কর, অথবা খাদ্যদ্রব্য উত্তম-রূপে চর্ব্বণ না কর, তবে এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকারের অনিষ্ট হইতে পারে। পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃৎ প্রভৃতি পরিপাক-ক্রিয়ার যন্ত্রগুলি প্রত্যহ অধিক পরিমাণে কার্য্য করিতে করিতে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে; তখন তোমার পরিপাক-শক্তি হ্রাস হইয়া নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি করিবে।

অতএব তুমি যদি সুস্থ ও সবল হইতে চাও, তাহা হইলে সর্ব্বদা পরিমিত রূপে আহার করিবে এবং আহারে বসিয়া কখনও তাড়াতাড়ি করিবে না, বেশ ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইবে।

---

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

## মস্তিষ্ক ও স্নায়ু।

তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের যে কোন অঙ্গের মাংস-পেশীর সঙ্কোচন এবং প্রসারণ হয়, সেই অঙ্গেরই চালনা বা গতি হয়, অর্থাৎ সেই অঙ্গই নড়ে। যে মুহূর্ত্তে আমরা হাত বা পা নাড়িতে চাই, সেই মুহূর্ত্তেই, হাত বা পায়ের মাংস-পেশী সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হইয়া হাত পা আমাদের ইচ্ছামত নড়িয়া থাকে। কিন্তু তোমরা কি কখনও ভাবিয়াছ, মাংস-পেশীগুলি কি প্রকারে জানিতে পারে যে, তুমি উহাদের সঙ্কোচন বা প্রসারণ করিতে বাসনা করিয়াছ ?

তোমরা হয় ত মনে করিতে পার যে, মাংস-পেশী আপনা হইতেই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। কিন্তু তাহা নহে। এক দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া বলিতেছি। মানুষের এক প্রকার রোগ হয়, তাহার নাম পক্ষাঘাত। যে অঙ্গে এই রোগ হয়, রোগী সেই অঙ্গ কিছুতেই নাড়িতে পারে না, উহা অবশ ও অসাড় হইয়া যায়। মনে কর, আমার দক্ষিণ বাহুতে পক্ষাঘাত হইয়াছে। তাহা হইলে আমি দক্ষিণ বাহু নাড়িতে পারিব না। অথচ পরীক্ষা করিয়া দেখ, আমার দক্ষিণ বাহুর মাংস-পেশী সমুদয় হয় ত তোমার বাহুর মাংস-পেশীরই মত সুস্থ ও সবল। তথাপি তাহার সঙ্কোচন ও প্রসারণ হয় না ( অর্থাৎ নড়ে না )। ইহা হইতে তোমরা বেশ বুঝিতে পারিবে যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনার জন্য মাংস-পেশী ব্যতীত আরও কিছু

আবশ্যক। মাংস-পেশী সকলকে কখন্ তুমি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে বলিতেছ, তাহা তাহারা আপনা হইতে জানিতে পারে না। **মস্তিষ্ক** ( brain ) ও **স্নায়ুর** ( nerves ) সাহায্যেই জানিতে পারে।

এস, আমরা মস্তিষ্ক ও স্নায়ু কি এবং তাহারা আমাদের কি কি কার্য্যে আইসে, তাহার আলোচনা করি।

চিত্র—১৭।

১—বৃহৎ মস্তিষ্ক। ২—ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক। ৩—মেরুমজ্জার মূল। ৪—মেরুমজ্জা।
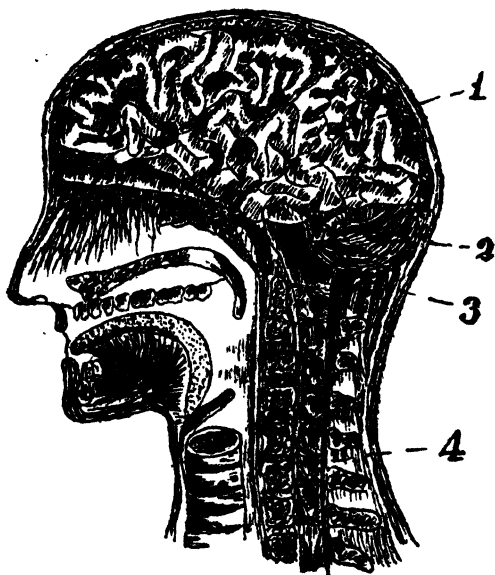
তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মস্তিষ্ক মাথার খুলির মধ্যে আছে, এবং খুলি মস্তিষ্ককে রক্ষা করিতেছে। মনুষ্যের মস্তিষ্ক ওজনে প্রায় দেড় সের। আকারের সহিত তুলনায় মনুষ্যের মস্তিষ্ক অন্যান্য প্রাণীর

মস্তিষ্ক অপেক্ষা অনেক বড়। দেখ, অশ্ব, মনুষ্য অপেক্ষা আকারে কত বৃহৎ, কিন্তু তাহার মস্তিষ্ক ওজনে মোটে আধ সের। মনুষ্যের এত বড় মস্তিষ্ক আছে বলিয়াই তাহারা বুদ্ধি ও অন্যান্য মানসিক-গুণে সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
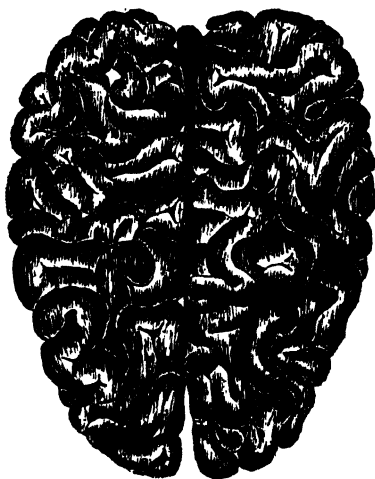
চিত্র ১৮—মস্তিষ্কের উপরিভাগের দৃশ্য।

যে পদার্থ দ্বারা মস্তিষ্ক নির্ম্মিত এবং যে পদার্থ দ্বারা মাংস-পেশী নির্ম্মিত, এই দুই পদার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। এক প্রকার নরম পদার্থ দ্বারা মস্তিষ্ক নির্ম্মিত। মাংস-পেশী দৃঢ়, কিন্তু মস্তিষ্ক নরম। এই নরম পদার্থ দুই রঙের—শাদা ও ধূসর। ধূসর পদার্থ মস্তিষ্কের উপরেই থাকে, ও শাদা পদার্থ ভিতরে থাকে। মস্তিষ্কের ভিতরে এবং বাহিরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য রক্ত-নালী আছে।

মস্তিষ্কের বাম দিকের অর্দ্ধেক বাদ দিলে মস্তিষ্ককে যেমন দেখায়, তাহা সপ্তদশ চিত্রে দেখান হইয়াছে।

উপর হইতে মস্তিষ্ককে যেমন দেখায় অষ্টাদশ চিত্রে তাহা দেখান হইয়াছে।

এই চিত্রে দেখিতে পাইতেছ যে, মস্তকের সম্মুখ হইতে পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত এক গভীর রেখা চলিয়া গিয়াছে। আরও দেখিতে পাইতেছ যে, মস্তিষ্কে অনেকগুলি ভাঁজ এবং সেই সকল ভাঁজের মধ্যে মধ্যে ফাটা রহিয়াছে।

মস্তিষ্কের দুই ভাগ আছে। ১—উপরের ভাগ, ২—নীচের ভাগ। (চিত্র ১৭)। মস্তিষ্কের $\frac{৭}{৮}$ অংশ লইয়া উপরের ভাগ। অতএব ইহাকে "বড় বা বৃহৎ মস্তিষ্ক" বলা যাইতে পারে। বৃহৎ মস্তিষ্কের পশ্চাতে ও তাহার একটু নীচে মস্তিষ্কের যে ছোট অংশ আছে, তাহাকে "ছোট বা ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক" বলা যাইতে পারে। বৃহৎ মস্তিষ্কের ন্যায়, ক্ষুদ্র মস্তিষ্কও ধূসর ও শ্বেত পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত।

মস্তিষ্কের কিয়দংশ এক ছিদ্র দিয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছে। (চিত্র ১৭, ১৯)। এবং নীচে নামিয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। মস্তিষ্কের এই অংশকে **মেরু-মজ্জা** (spinal cord) বলে।

এখন দেখা যাউক্ মেরুমজ্জা মেরুদণ্ডের ভিতরে কি প্রকারে প্রবেশ করিয়াছে।

তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মেরুদণ্ডে ছাব্বিশখানি পৃথক্ পৃথক্ হাড় আছে এবং একখানি অন্যের উপরে সাজান আছে। এই হাড় সকলের প্রত্যেকখানির মধ্যস্থলে এক একটী ছিদ্র আছে। হাড়গুলি একটী অপরের উপরে সাজান আছে বলিয়া সমস্ত ছিদ্রগুলি মিলিয়া মেরুদণ্ডের ভিতরে, (খুলির নিম্নদেশ হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত) একটী ফাঁপা নালীর মত হইয়াছে। মেরুমজ্জা খুলির নিম্নদেশ হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত এই নালী দিয়া সোজা চলিয়া গিয়াছে।

চিত্র ১৯—মস্তিষ্ক ও মেরু-মজ্জা।

১—বৃহৎ মস্তিষ্ক। ২—ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক। ৩—মেরু-মজ্জার মূল। ৪—মেরু-মজ্জা।
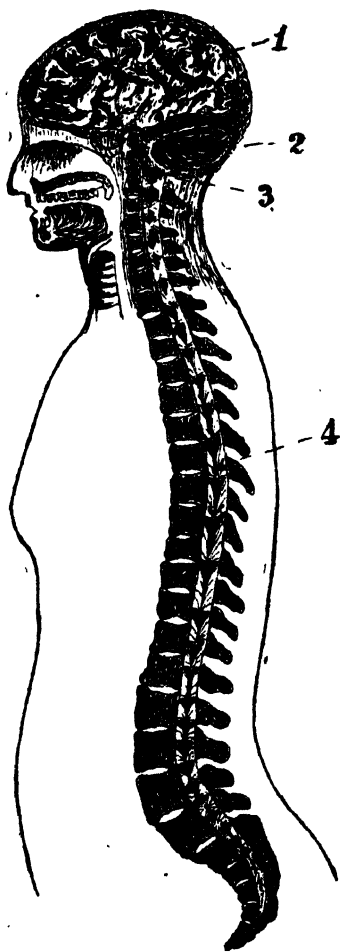
মেরুদণ্ডকে পূর্ব্বে হাড়ের মালা বলিয়াছি। এই হাড়ের মালা মেরু-মজ্জারূপ সূত্র দ্বারা গাঁথা।

মস্তিষ্কের ন্যায় মেরুমজ্জাও সেই ধূসর ও শ্বেত পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। কিন্তু প্রভেদ এই যে, মেরুমজ্জার শ্বেত পদার্থ উপরে থাকে এবং ধূসর পদার্থ ভিতরে থাকে। মেরুমজ্জা প্রায় ১৮ ইঞ্চ লম্বা এবং আমাদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির ন্যায় স্থূল হইবে।

মেরুমজ্জার উপরের খানিকটা অংশ স্থূল। এই স্থূল অংশ খুলির ভিতরে বৃহৎ মস্তিষ্কের নীচে আছে। ইহাকে "মেরুমজ্জার মূল" ( spinal bulb) বলে। মেরুমজ্জার মূলের দৈর্ঘ্য প্রায় ১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চ এবং ব্যাস প্রায় $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চ হইবে।

মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা এবং ইহার মূল হইতে অনেকগুলি লম্বা শাদা এবং অত্যন্ত দৃঢ় সূত্র বাহির হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। এই সূত্রগুলিকে **স্নায়ু** ( nerves ) বলে। ( চিত্র ২০, ২১ )

মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জার মূল হইতে ১২ যোড়া স্নায়ু বাহির হইয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ ও মুখের উপরের মাংস-পেশীগুলির মধ্যে গিয়াছে। (চিত্র ২০)। এতদ্ব্যতীত মেরুমজ্জার প্রত্যেক পার্শ্ব হইতে ৩১টী করিয়া স্নায়ু বাহির হইয়া দেহের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। ( চিত্র ২১ )

মেরুদণ্ডের প্রত্যেক দুইটী হাড়ের মধ্যে যে অল্প একটু ফাঁক থাকে, তাহা দিয়া ঐ ৩১ জোড়া স্নায়ু বাহির হইয়াছে। এই স্নায়ুগুলির প্রত্যেকটী মেরুমজ্জা হইতে বাহির হইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কতকগুলি এত সূক্ষ্ম যে, খালি চোখে ইহাদিগকে দেখাই যায় না। কতকগুলি স্নায়ু শরীরের সমস্ত মাংস-পেশীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে, কতকগুলি চামড়ার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে। মোট কথা, রক্ত-নালীর মত স্নায়ুও শরীরের সর্ব্বত্র রহিয়াছে।

তোমরা বড় বড় সহরে রেলের লাইনের ধারে টেলিগ্রাফের তার

দেখিয়াছ ত? এই স্নায়ু সকল কতকটা টেলিগ্রাফের তারের ন্যায় কার্য্য করে। কলিকাতা নগরে এক প্রধান টেলিগ্রাফ আপিস আছে এবং অনেক
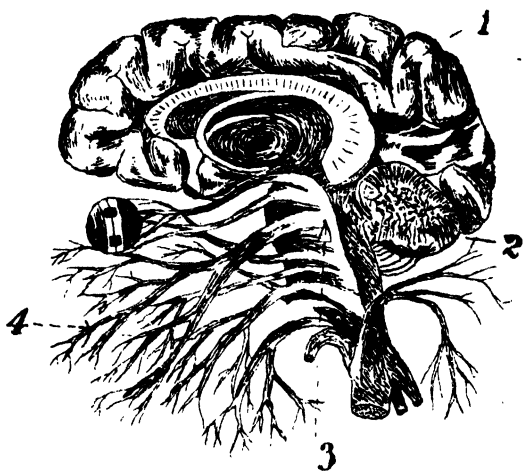
চিত্র ২০—মস্তিস্ক এবং মেরুজ্জার মূল।

১।—বৃহৎ মস্তিষ্ক। ২।—ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক। ৩।—মেরু-মজ্জার মূল। ৪।—মেরু-মজ্জার মূলদেশ হইতে নিঃসৃত স্নায়ুসমূহ।

শাখা-আপিসও আছে। যথা, বৌবাজার শাখা-টেলিগ্রাফ-আপিস, বারাকপুর শাখা-টেলিগ্রাফ-আপিস, শ্রীরামপুর শাখা-টেলিগ্রাফ-আপিস প্রভৃতি। প্রধান টেলিগ্রাফ আপিস হইতে প্রত্যেক শাখা-টেলিগ্রাফ আপিসে তার গিয়াছে। তুমি যদি কোন শাখা-আপিসে টেলিগ্রাফ দাও, তাহা হইলে শাখা-টেলিগ্রাফ-আপিস তার করিয়া প্রধান-টেলিগ্রাফ-আপিসে পাঠাইয়া দিবে।

তোমার শরীরে যেখানে কোন একটী স্নায়ু আসিয়া শেষ হইয়াছে,
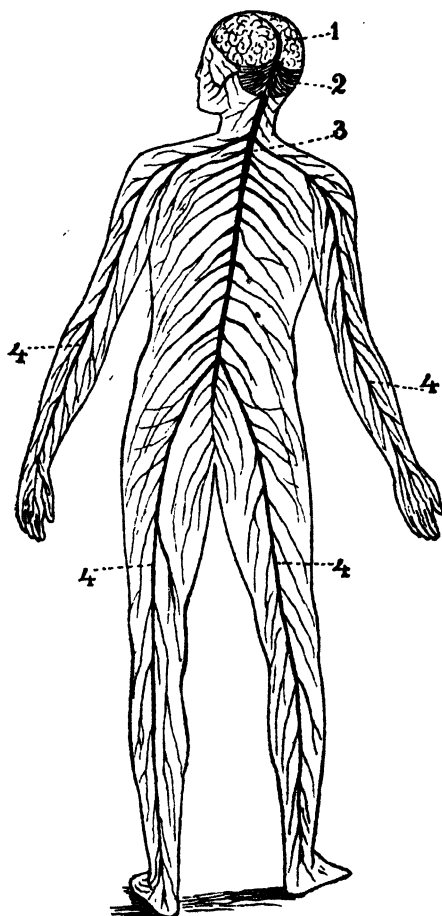
চিত্র ২১—মস্তিষ্ক ও স্নায়ু।

১।—বৃহৎ মস্তিষ্ক। ২।—ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক। ৩।—মেরু-মজ্জা। ৪।—মেরু-মজ্জা হইতে নিঃসৃত স্নায়ুসমূহ।

সেই স্থান একটী শাখা-টেলিগ্রাফ-আপিসের ন্যায়। এইরূপ অসংখ্য শাখা-টেলিগ্রাফ-আপিস তোমার শরীরের সর্ব্বত্র আছে। তোমার মস্তিষ্ক প্রধান টেলিগ্রাফ-আপিসের ন্যায়। যেমন প্রধান টেলিগ্রাফ-আপিস হইতে শাখা-টেলিগ্রাফ-আপিসে তার গিয়াছে, তেমনি মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ু শরীরের সর্ব্বত্র গিয়াছে।

শরীরে কতকগুলি এমন স্নায়ু আছে, যাহারা বহির্জ্জগতের সংবাদ মস্তিষ্কে সতত প্রেরণ করে। এই স্নায়ু সকলের সাহায্যেই আমরা দেখিতে, শুনিতে, আস্বাদ লইতে, স্পর্শ করিতে এবং আঘ্রাণ লইতে সমর্থ হই। এই প্রকারের স্নায়ু নখ ও চুল ব্যতীত আমাদের শরীরের সকল স্থানেই আছে। নখ ও চুলে নাই বলিয়া, নখ ও চুল কাটিবার সময় আমরা বেদনা পাই না। যদি শরীরের অন্য কোন স্থানে আল্‌পিন্‌ বিদ্ধ করিয়া দাও, তাহা হইলে সেই স্থানের স্নায়ু সকল সেই বার্ত্তা তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্ককে দিবে। মস্তিষ্ক এই সংবাদ পাইবামাত্র আমরা বিদ্ধ স্থানে তৎক্ষণাৎ ব্যথা অনুভব করিব। কোন শব্দ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র কর্ণের স্নায়ু সকল সেই সংবাদ মস্তিষ্ককে প্রদান করে। তখনই আমরা সেই শব্দ শুনিতে পাই।

কলিকাতার প্রধান টেলিগ্রাফ-আপিস হইতে বৌবাজার শাখা-টেলিগ্রাফ-আপিসে যে তার গিয়াছে, মনে কর, তুমি তাহাকে মধ্যস্থলে কাটিয়া দিলে। তাহা হইলে বৌবাজার-শাখা-আপিস প্রধান আপিসে সংবাদ দিতে পারিবে না। সেই প্রকার, শরীরের কোন স্থানের স্নায়ু যদি কাটিয়া দাও, (অর্থাৎ উহা যদি কোন প্রকারে আঘাতাদি প্রাপ্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়) তাহা হইলে সেই স্নায়ু বহির্জ্জগতের কোন বার্ত্তাই মস্তিষ্ককে দিতে পারিবে না। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি, আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। মস্তিষ্ক হইতে যে স্নায়ু আমার চক্ষে আসিয়াছে, মনে কর, তুমি সেই স্নায়ু কাটিয়া দিলে, কিম্বা রোগ হইয়া, বা আঘাত লাগিয়া, বা অন্য কোন কারণে তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। ইহার ফলে, আমার চক্ষু ও মস্তিষ্ক

সুস্থ থাকা সত্ত্বেও আমি কিছুই দেখিতে পাইব না, আমি সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া থাকিব। এ পর্য্যন্ত যে স্নায়ু সকলের কথা বলিলাম, তাহারা কেবল বহির্জ্জগতের বার্ত্তা লইয়া উর্দ্ধে মস্তিষ্কের নিকট জ্ঞাপন করে। অতএব ইহাদিগকে "বার্ত্তাবাহী বা উর্দ্ধগামী অথবা জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু" বলা যাইতে পারে।

বার্ত্তাবাহী স্নায়ু ব্যতীত আর এক শ্রেণীর স্নায়ু আছে। এই স্নায়ু-গুলি শরীরের সকল মাংস-পেশীর মধ্যে থাকে। ইহারা মস্তিষ্কের আজ্ঞা লইয়া নিম্নে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জ্ঞাপন করে। অতএব, এই স্নায়ু সকলকে "আজ্ঞাবাহী বা নিম্নগামী বা গতি-উৎপাদক স্নায়ু" বলা যাইতে পারে।

এই আজ্ঞাবাহী স্নায়ু সকলের সাহায্যেই আমরা ইচ্ছামত আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়িতে পারি। মনে কর, আমি দক্ষিণ হস্তটী উঠাইতে ইচ্ছা করিলাম। মস্তিষ্ক তখন আজ্ঞাবাহী স্নায়ুকে আজ্ঞা দিবে :—"আজ্ঞাবাহী স্নায়ু, দক্ষিণ হস্তখানি উঠাইতে হইবে। অতএব তুমি ইহার মাংস-পেশী সকলকে এখনি আমার আজ্ঞা জানাও যে, তাহারা যেন অবিলম্বে সঙ্কুচিত হয়।" আজ্ঞাবাহী স্নায়ু দ্বারা (যেন টেলিগ্রাফের তার দ্বারা) মস্তিষ্কের সেই আজ্ঞা দক্ষিণ হস্তের মাংস-পেশী সকলের নিকট তৎক্ষণাৎ পৌঁছিল। মাংস-পেশী সকল অবিলম্বে সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণ হস্তটীকে উঠাইয়া দিল।

যদি শরীরের কোন স্থানের আজ্ঞাবাহী স্নায়ু সকল নষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই স্থান নড়িতে পারে না। পক্ষাঘাত রোগে ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে। মনে কর, আমার দক্ষিণ হস্তে পক্ষাঘাত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, আমার দক্ষিণ হস্তের মাংস-পেশী সকলের মধ্যে যে সমুদয় স্নায়ু আছে, তাহা পক্ষাঘাত রোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাওয়াতে, সেই স্নায়ু সকল মস্তিষ্কের আজ্ঞা দক্ষিণ হস্তের মাংস-পেশী সকলের নিকট লইয়া যাইতে পারে না। (টেলিগ্রাফের তার কাটিলে যেমন হয়)। অতএব আমার হস্তও অচল

হইয়া থাকে। আমি ইচ্ছা করিলেও আমার পক্ষাঘাত-রোগগ্রস্ত হস্ত কদাচ নড়িবে না। অতএব দেখিতেছ যে, যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিকে আমরা ইচ্ছামত নাড়াইয়া থাকি, তাহাদের গতি বা চালনা এই আজ্ঞাবাহী স্নায়ু সকলের উপর নির্ভর করিতেছে।

এই দুই প্রকার স্নায়ু ব্যতীত আরও এক প্রকার স্নায়ু আছে—যাহা আমাদের হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, অন্ত্র প্রভৃতির মাংস-পেশীর ( যেগুলি আমাদের বশবর্ত্তী নহে ) গতি উৎপাদন করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর স্নায়ুগুলি ঐ সকল স্থান হইতে মস্তিষ্কে সংবাদ লইয়া যায় এবং মস্তিষ্কের আজ্ঞা লইয়া সেই সকল মাংস-পেশীকে জানায়। এইরূপ যাবজ্জীবন, দিবা রাত্রি প্রতিমুহূর্ত্ত সংবাদ যাইতেছে এবং আসিতেছে। কিন্তু আমরা ইহার কিছুই জানিতে পারি না।

উপরে তোমাদিগকে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে তোমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে, মস্তিষ্ককে শরীরের রাজা এবং অন্যান্য অঙ্গকে উহার ভৃত্য বলা যাইতে পারে; যেহেতু মস্তিষ্কই স্নায়ুর সাহায্যে শরীরের মাংস-পেশীগুলিকে ( তাহা আমাদের আয়ত্তে থাকুক্ অথবা নাই থাকুক্ ) সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিয়া আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যথোপযুক্ত গতি উৎপাদন করিতেছে এবং মস্তিষ্কই আমাদিগকে দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, আস্বাদ লওয়াইতেছে, শ্বাস লওয়াইতেছে, স্পর্শ করাইতেছে এবং ঘ্রাণ লওয়াইতেছে।

এক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, "আমরা চোখ দিয়া দেখি না, মস্তিষ্ক দিয়া দেখি; কাণ দিয়া শুনি না, মস্তিষ্ক দিয়া শুনি, ইত্যাদি।" কথাটা বড় মিথ্যা নয়। ঐ কথার অর্থ এই যে, মস্তিষ্ক না থাকিলে, সুস্থ, সবল চক্ষু থাকিলেও আমরা দেখিতে পাইতাম না; মস্তিষ্ক না থাকিলে, সুস্থ, নীরোগ কর্ণ থাকিলেও আমরা শুনিতে পাইতাম না, ইত্যাদি। কিন্তু এই সঙ্গে তোমাদিগকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে,

মস্তিষ্ক থাকিয়াও চক্ষু, কর্ণ না থাকিলে আমরা দেখিতে বা শুনিতে পাইতাম না।

মনে কর, তুমি এক মনে কোন কার্য্য করিতেছ। তোমার গাত্রে একটী মশা বা মাছি বসিল, বা মৃতুস্বরে তোমাকে কেহ ডাকিল। তোমার চামড়ায় যে স্নায়ু আছে, তাহারা সেই মশা বা মাছি বসার সংবাদ বা কর্ণের স্নায়ু সেই শব্দের সংবাদ মস্তিষ্ককে দিল। কিন্তু মস্তিষ্ক অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায়, সেই সংবাদ গ্রহণ করিতে পারিল না। তুমি মশা বা মাছি বসা অনুভব করিতে পারিলে না, ডাকার শব্দও তুমি শুনিতে পাইলে না। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা বলিতে পারি না কি যে, মস্তিষ্কই অনুভব করে ও শব্দ শুনে?

মস্তিষ্ক আমাদের আরও অনেক উপকারে আইসে। মস্তিষ্ক হইতেই আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা,—ভয়, ঘৃণা, ভালবাসা, দয়া প্রভৃতি এবং ইহা হইতেই আমরা বুদ্ধি, চিন্তা, স্মরণ-শক্তি প্রভৃতিও লাভ করিয়া থাকি।

পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, মস্তিষ্কের তিন ভাগ আছে। যথা—(১) বৃহৎ মস্তিষ্ক, (২) ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক, এবং (৩) মেরুমজ্জার মূল। মস্তিষ্কের এই তিন ভাগ ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে। কোন্ ভাগ কি কাজ করে তাহা বলিতেছি।

বৃহৎ মস্তিষ্কের বুদ্ধি, স্মৃতি, অনুভব-শক্তি এবং ইচ্ছামত শরীরের যে কোন অঙ্গের গতি উৎপাদন করিবার ক্ষমতা আছে। যেমন হেড্‌মাষ্টার মহাশয় স্বয়ং স্কুলে প্রধান কার্য্যগুলি করিয়া থাকেন এবং সামান্য সামান্য কার্য্যগুলি ক্লার্ক কিম্বা অন্যান্য মাষ্টারগণের উপর ছাড়িয়া দেন, সেইরূপ বৃহৎ মস্তিষ্ক বুদ্ধির কার্য্য, স্মৃতির কার্য্য প্রভৃতি কঠিন ও প্রধান কার্য্যগুলি নিজে করিয়া থাকে; শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্য ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার উপর ছাড়িয়া দেয়। বৃহৎ মস্তিষ্ককে সামান্য সামান্য কার্য্য করিতে হইলে

প্রধান কার্য্যগুলি করিবার অবকাশ থাকিত না। যদি কোন প্রকারে আমার বৃহৎ মস্তিষ্কে আঘাত লাগে, তাহা হইলে আমার বুদ্ধি, স্মৃতি, অনুভব শক্তি এবং ইচ্ছামত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতি উৎপাদন করিবার শক্তি লোপ পাইবে। আমার কিছুই মনে থাকিবে না, আমি আমার জীবনের সকল ঘটনা ভুলিয়া যাইব ; মুখে খাদ্য দিলে খাইব, নচেৎ খাইব না ; ইচ্ছা করিয়া আমি স্বয়ং কোন কাজ করিতে পারিব না ; কোন অঙ্গ নাড়িতে পারিব না। অত্যধিক মদ্যপান বা অন্য কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিলে বা হর্ষশোকজনিত আকস্মিক অত্যধিক মানসিক আবেগ হইলে, বৃহৎ মস্তিষ্কে আঘাত লাগে।

যে সকল কার্য্যে একই সময়ে অনেকগুলি মাংস-পেশীর চালনা হয়, ( যথা, দাঁড়ান, বেড়ান, দৌড়ান, লাফান, কথা বলা প্রভৃতি ) ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আছে বলিয়া আমরা সেই সমস্ত কার্য্য করিতে পারি। যদি আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আঘাত লাগিয়া নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে আমি ইচ্ছামত দাঁড়াইতে, কথা কহিতে বা অন্য কোন শারীরিক কার্য্য করিতে পারিব না। আমাকে চিৎ করিয়া শোওয়াইয়া দিলে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা থাকিলেও আমি উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিব না, কেবল বৃথা হাত পা ছুঁড়িব। আমাকে দাঁড় করাইয়া দিলে, আমার দাঁড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও আমি মাটীতে পড়িয়া যাইব।

এইবার মেরুমজ্জার মূলের কার্য্যকারিতার বিষয়ে আলোচনা করা যাউক্। তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, আমাদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত শরীরের কতকগুলি মাংস-পেশীর ( যথা, হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র, পাকস্থলী প্রভৃতির ) সঙ্কোচ ও প্রসারণ প্রতিমুহূর্ত্তেই হইতেছে ; ইহাদের সঙ্কোচ ও প্রসারণ আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, তাহাও তুমি জান। ইহাদের নিয়মিত গতি আমাদের জীবনের পক্ষে ,কতদূর আবশ্যক তাহা তোমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছ। কে ইহাদিগকে চালাইতেছে ? মেরুমজ্জার মূলই ইহাদিগকে চালাইতেছে।

ইহার উপরের অংশ (যাহা বৃহৎ মস্তিষ্কের ঠিক নীচে রহিয়াছে, তাহা) দ্বারাই আমরা দেখিতে, শুনিতে, স্পর্শ করিতে, আঘ্রাণ লইতে এবং আস্বাদ লইতে সমর্থ হই। ইহা গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারিব না, ইচ্ছা করিলেও শরীরের কোন অঙ্গ নাড়িতে পারিব না, কারণ ইহা নষ্ট হওয়ায়, বৃহৎ মস্তিষ্কের সহিত শরীরের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়। কিন্তু যদি ঘাড়ে সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়া বা অন্য কোন কারণে মেরুমজ্জার মূল নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ শ্বাস-ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে, এবং অবিলম্বে মৃত্যু হইবে।

স্নায়ুর সাহায্যে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সংবাদ প্রথমে মেরুমজ্জায় আসিয়া পৌঁছে। মেরুমজ্জা সেই সংবাদ মস্তিষ্কে প্রেরণ করে এবং মস্তিষ্ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যে আজ্ঞা দেয়, তাহাও প্রথমে মেরুমজ্জায় আইসে। মেরুমজ্জা তখন সেই আজ্ঞা স্নায়ুর সাহায্যে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে। হঠাৎ পড়িয়া গিয়া যদি মেরুমজ্জায় আঘাত লাগে তাহা হইলে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের নীচে শরীরের যে ভাগ, তাহার সহিত মস্তিষ্কের আর কোন সম্বন্ধ থাকে না; সুতরাং, শরীরের সেই নীচের ভাগ অবশ ও অসাড় হইয়া যায়, তাহাতে কোন অনুভব-শক্তি থাকে না এবং তাহা নড়িতেও পারে না।

মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুর বিষয়ে এপর্য্যন্ত তোমরা যাহা শিখিলে, তাহা হইতে তোমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, মস্তিষ্কই স্নায়ুর সাহায্যে আমাদিগকে মানসিক কার্য্য (যথা, চিন্তা করা, মনে রাখা প্রভৃতি) এবং শারীরিক কার্য্য (যথা, অঙ্গাদির চালনা) করাইয়া থাকে। এখন বোধ হয় তোমরা বেশ বুঝিতে পারিবে যে, মস্তিষ্ক কিরূপ প্রয়োজনীয় অঙ্গ এবং মস্তিষ্ককে সুস্থ ও সবল রাখা কিরূপ আবশ্যক।

মস্তিষ্কে প্রচুর রক্ত যাওয়া আবশ্যক। কারণ, তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রক্ত খাদ্য হইতে পুষ্টিকর পদার্থ চুষিয়া লইয়া সর্ব্বাঙ্গে

(অতএব মস্তিষ্কেও) বিতরণ করে। সুতরাং মস্তিষ্ককে সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে আমাদের পুষ্টিকর খাদ্য আহার করা বিশেষ আবশ্যক। যে সকল খাদ্যে শরীরের পুষ্টি হয়, তাহাতে মস্তিষ্কেরও পুষ্টি হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের পুষ্টির জন্য বিশুদ্ধ বায়ুরও প্রয়োজন; কারণ বিশুদ্ধ বায়ু ফুস্‌ফুসে না গেলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয় না। দূষিত রক্ত পরিষ্কার না হইলে রোগ হয়। রোগ হইলে শরীর ও মস্তিষ্ক উভয়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করিলে (অর্থাৎ মাংস-পেশী সকলের যথোপযুক্ত চালনা করিলে) মাংস-পেশী সকল যেমন পুষ্ট, সুস্থ, দৃঢ় এবং সবল হয়, তেমনি মানসিক পরিশ্রম করিলে (অর্থাৎ মস্তিষ্কের উপযুক্ত চালনা করিলে) মস্তিষ্কের ক্ষমতাও বাড়িয়া যায়। তুমি দশ মিনিটের অধিক তোমার পাঠ্য-পুস্তক নিবিষ্ট মনে পড়িতে পার না; দশমিনিটের পরেই তোমার মন অন্য দিকে যাইতে থাকে। কিন্তু আমাদিগকে বল, আমরা একখানি বই নিবিষ্ট মনে দুই তিন ঘণ্টা কাল পড়িয়া যাইব, মন অন্যদিকে যাইবে না। আমরা বাল্যকাল হইতে মস্তিষ্কের চালনা করিয়া আসিতেছি বলিয়াই একাগ্রচিত্তে অনেকক্ষণ কার্য্য করিতে পারি; তোমরাও এখন হইতেই মস্তিষ্কের উপযুক্ত চালনা করিলে তোমাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে এবং তোমরাও আমাদের ন্যায় একাগ্রচিত্তে অনেকক্ষণ কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে।

অধিকক্ষণ শারীরিক পরিশ্রম করিলে যেমন শরীরে ক্লান্তি হয়, একাদিক্রমে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করিলেও সেইরূপ হইয়া থাকে। এইজন্য মস্তিষ্কের বিশ্রামও একান্ত আবশ্যক।

---

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

## চক্ষু ও কর্ণের গঠন।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, যে স্নায়ু মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া চক্ষুতে ও কর্ণে গিয়াছে, সেই স্নায়ুর সাহায্যেই আমরা দেখিয়া এবং শুনিয়া থাকি। এই পরিচ্ছেদে তোমাদিগকে চক্ষু ও কর্ণের গঠন-প্রণালী-সম্বন্ধে কিছু বলিব। এই গঠন-প্রণালী পড়িলে, কি করিয়া চক্ষু ও কর্ণ বহির্জ্জগতের সংবাদ মস্তিষ্কে প্রেরণ করে, তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে।

**চক্ষুর গঠন-প্রণালী।** মস্তকের সম্মুখের হাড় এবং মুখের হাড় মিলিয়া যে দুইটী কোটর হইয়াছে, তাহার মধ্যেই চক্ষু দুইটী রহিয়াছে। চক্ষুর আকার ছোট একটী গোলক বা বলের মত। চক্ষুর সম্মুখের দিক্ একটু বাহির হইয়া আছে। (চিত্র ২২)

চক্ষু-গোলকের চারিদিকে মোটা ও শাদা চামড়ার একটী আবরণ আছে। চক্ষুর মধ্যভাগে, চক্ষুর "তারা" বা "মণি"র সম্মুখে, এই আবরণের যে অংশটুকু আছে, তাহা কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ। কাঁচের ন্যায় ইহার মধ্য দিয়াও আলোক প্রবেশ করিতে পারে। অতএব ইহাকে "চক্ষুর জানালা" বলা যাইতে পারে।

এই জানালার পশ্চাতে এক গোল রঙ্গিন পর্দ্দা আছে। এই পর্দ্দার মধ্যভাগে এক ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রকে আমরা চক্ষুর "তারা" বা "মণি" বলি। এই ছিদ্র দিয়া চক্ষুর ভিতরে আলোক প্রবেশ করে। কাহারও চক্ষুর দিকে তাকাইলে আমরা এই পর্দ্দা এবং তাহার মধ্যস্থিত ছিদ্রটী দেখিতে পাই।

তোমরা সকলেই জান যে, চক্ষুর তারা কাল। কিন্তু উহা কাল দেখায় কেন, বলিতে পার? চক্ষুর পশ্চাদ্ভাগে একটী কাল পাতলা আবরণ ( retina ) আছে; উপরি-উক্ত রঙ্গিন পর্দ্দার ছিদ্র দিয়া এই কাল আবরণ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া চক্ষুর তারা কাল বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে চক্ষুর সম্মুখ ভাগের আবরণ কাল নয়; ইহা কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ।
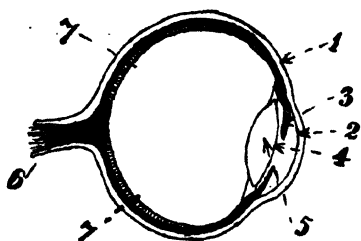
চিত্র ২২—চক্ষু

১—বাহিরের শাদা আবরণ। ২—স্বচ্ছ আবরণ। ৩—গোল রঙ্গিন পর্দ্দা। ৪—তারা। ৫—চক্ষুর কাঁচ। ৬—চক্ষুর স্নায়ু। ৭—রেটিনা।

গোল রঙ্গিন পর্দ্দার পশ্চাতে একখণ্ড স্বচ্ছ পদার্থ আছে। এই পদার্থের উভয় পার্শ্ব কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় গোল এবং ইহার মধ্যভাগ মোটা, কিন্তু পার্শ্বভাগ পাতলা। ( চিত্র ২৩ )

চিত্র ২৩।

একপ্রকার কাঁচ ( burning glass ) আছে—যাহা সূর্য্যের দিকে করিয়া, খানিক দূরে একখণ্ড কাগজ রাখিলে, কাগজ জ্বলিয়া উঠে,

ইহাকে ইংরাজিতে "কন্‌ভেক্‌স্ লেন্স" ( convex lens ) বলে। চক্ষুর এই পদার্থও সেই কাঁচের ন্যায়। ইহাকে "চক্ষুর কাঁচ" (eye lens) বলা যাইতে পারে।

এই চক্ষুর কাঁচ (লেন্স) চক্ষু-গোলককে দুইটী কোষ্ঠে বিভক্ত করিয়াছে, একটী কোষ্ঠ সম্মুখে, অপরটী পশ্চাতে। সম্মুখের কোষ্ঠ পশ্চাতের কোষ্ঠ অপেক্ষা ছোট এবং ইহাতে পরিষ্কার জলের মত এক স্বচ্ছ পদার্থ আছে। পশ্চাতের বড় কোষ্ঠটীও, ডিমের ভিতরের শাদা পদার্থের ন্যায় একপ্রকার ঘন, শাদা অথচ স্বচ্ছ তরল পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ।

চক্ষুর চিত্রের একেবারে পশ্চাতে তোমরা একটী ছোট ছিদ্র দেখিতে পাইবে। এই ছিদ্র দিয়া মস্তিষ্ক হইতে এক স্নায়ু আসিয়া চক্ষু-গোলকে প্রবেশ করিয়াছে। এই স্নায়ুকে "চক্ষুর স্নায়ু" বলে।

চক্ষুর স্নায়ু চক্ষুগোলকে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে এবং চক্ষু-গোলকের ভিতরে কাল আবরণের উপর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে। চক্ষু-গোলকের পশ্চাদ্ভাগের এই সূক্ষ্ম-স্নায়ু-পরিব্যাপ্ত কাল আবরণটীকে ইংরাজিতে "রেটিনা" ( retina ) বলে। আমরাও ইহাকে রেটিনাই বলিব।

চক্ষুর ভিন্ন ভিন্ন ভাগের পরিচয় তোমরা পাইলে। এখন কোন্ ভাগের কি কার্য্য তাহা বলিতেছি, শুন।

প্রথমে চক্ষুর কাঁচের ( লেন্সের ) কার্য্যের কথা বলি। ডিম্বের ন্যায় স্থূল-মধ্য মোটা একখণ্ড কাঁচ ( convex lens বা burning glass ) লও। সেই কাঁচ লইয়া তোমার বন্ধুর সহিত তোমার পড়িবার ঘরে যাও। ঘরের জানালা দরজা সব বন্ধ করিয়া ঘরটীকে অন্ধকার কর। তাহার পরে একটী মোমবাতি জ্বালিয়া টেবিলের এক পার্শ্বে রাখ। টেবিলের অপর পার্শ্বে তোমার বন্ধুকে এক খণ্ড বড় কাল কাগজ সোজা করিয়া ধরিয়া রাখিতে বল। মোমবাতি ও কাগজের মধ্যস্থলে মোমবাতির সম্মুখে কিছু দূরে

তুমি সেই কাঁচখানি ধর, তাহা হইলে কাঁচের মধ্য দিয়া মোমবাতির আলো কাগজে পড়িবে। এইরূপ করিলে দেখিবে যে, কাগজের উপরে মোমবাতির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। কিন্তু দেখিবে যে, প্রতিবিম্বটী উল্টা।

কিন্তু হয় ত তোমার প্রতিবিম্বটী স্পষ্ট হয় নাই। যদি স্পষ্ট না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার বন্ধুকে বল, "কাগজখানি ধরিয়া ধীরে ধীরে কাঁচের দিকে সরাইয়া আন।" আর তুমি দেখিতে থাক, প্রতিবিম্বটী আরও স্পষ্ট হইতেছে কি না।

ইহাতেও প্রতিবিম্বটী স্পষ্ট না হইলে, তোমার বন্ধুকে কাগজখানি একটু একটু করিয়া যতক্ষণ না প্রতিবিম্ব কাগজের উপর স্পষ্টরূপে দেখা যায়, পশ্চাদ্দিকে সরাইতে বল। কাঁচ হইতে কাগজখানি এক নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে রাখিলে প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হইবে; এমন কি সামান্য অগ্র-পশ্চাৎ করিলেই পুনরায় অস্পষ্ট হইয়া যাইবে।

মনুষ্যের চক্ষুতেও ঠিক এইরূপ হয়। দৃষ্ট বস্তু হইতে আলোক চক্ষুর তারা ও কাঁচের মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। (যেমন মোমবাতির আলো কাঁচের মধ্য দিয়া কাগজে পড়িয়াছিল)। তাহার পর সেই আলোক চক্ষুর বৃহৎ কোষ্ঠের সেই ঘন তরল পদার্থের মধ্য দিয়া যাইয়া, চক্ষু-গোলকের পশ্চাতে রেটিনার উপরে দৃষ্ট বস্তুর স্পষ্ট কিন্তু উল্টা প্রতিবিম্ব ফেলে। স্নায়ুগুলি সেই সংবাদ মস্তিষ্কে লইয়া যায় বলিয়াই আমরা তখন সেই বস্তুটীকে দেখিতে পাই।

তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, "যে কাগজের উপর মোমবাতির প্রতিবিম্ব পড়িল, তাহা না হয় নিকটে বা দূরে লইয়া প্রতিবিম্বটীকে স্পষ্ট করিলাম। কিন্তু চক্ষুর ভিতরে রেটিনাও কি অগ্রপশ্চাতে সরিয়া যায়?" না, তাহা যায় না।

তুমি আপত্তি করিবে, "তাহা হইলে দৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সকলের স্পষ্ট প্রতিবিম্ব রেটিনার উপর পড়িতে পারে না, কোন কোনটার পারে বটে।"

এক অদ্ভুত কৌশলদ্বারা রেটিনাকে না সরাইয়াও তাহার উপর সকল দৃষ্ট বস্তুর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়ে।

তোমার বন্ধুকে কাগজ সরাইতে নিষেধ কর।

মোমবাতির প্রতিবিম্ব কাগজের উপর স্পষ্ট না পড়িলে, তুমি যে কাঁচ, মোমবাতি ও কাগজের মধ্যস্থলে ধরিয়া আছ, তাহা রাখিয়া দিয়া, তাহা অপেক্ষা এক মোটা কাঁচ লও। ইহা মধ্যস্থলে ধর। ইহাতেও যদি প্রতিবিম্ব স্পষ্ট না হয়, তাহা হইলে আরও মোটা কাঁচ লও। ইহাতে প্রতিবিম্ব পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট হইবে। ক্রমাগত কাঁচ বদলাইয়া দেখিবে যে, এক নির্দ্দিষ্ট মোটা কাঁচের সাহায্যে প্রতিবিম্বটী কাগজের উপর স্পষ্টরূপে পড়িয়াছে।

যদি মোমবাতিকে সরাইয়া একটু নিকটে আন, তাহা হইলে প্রতিবিম্ব স্পষ্ট করিবার জন্য আরও মোটা কাঁচের প্রয়োজন হইবে। মোমবাতিকে সরাইয়া দূরে লইয়া গেলে, তাহার প্রতিবিম্ব স্পষ্ট করিবার জন্য পাতলা কাঁচের প্রয়োজন। অর্থাৎ নিকটস্থ বস্তুর প্রতিবিম্বকে স্পষ্ট করিবার জন্য মোটা কাঁচ এবং দূরের বস্তুর প্রতিবিম্বকে স্পষ্ট করিবার জন্য পাতলা কাঁচের প্রয়োজন।

এখন, নিকটস্থ বস্তুর দিকে তাকাইলে আমাদের চক্ষুর ভিতর কি হয়, তাহা দেখা যাউক্। নিকটস্থ বস্তুর দিকে তাকাইলে, তাহার স্পষ্ট প্রতিবিম্ব রেটিনার একটু পশ্চাতে পড়ে, ঠিক্ রেটিনার উপর পড়ে না। যদি রেটিনাকে একটু পশ্চাতে সরান যাইত, তাহা হইলে তাহার উপর স্পষ্ট প্রাতবিম্ব পড়িত। কিন্তু রেটিনাকে সরান যায় না। তজ্জন্য চক্ষুর কাঁচ মোটা হইয়া রেটিনার উপর সেই নিকটস্থ বস্তুর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব ফেলে। দৃষ্ট বস্তু যতই নিকটে হয়, চক্ষুর কাঁচ ততই মোটা হয়। দূরের বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষুর কাঁচ পাতলা হয়।

এইরূপে নিকটস্থ বা দূরস্থ সকল দৃষ্ট বস্তুরই স্পষ্ট প্রতিবিম্ব রেটিনার উপর পড়ে। দেখিলে, ভগবানের কি অদ্ভুত নির্ম্মাণ-কৌশল!

চক্ষু-গোলকের ভিতরে, চক্ষুর কাঁচের দুই পার্শ্বে, কতকগুলি ছোট ছোট মাংস-পেশী আছে। ইহাদের সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারাই চক্ষুর কাঁচ মোটা ও পাতলা হইয়া থাকে। চক্ষুর কাঁচ মোটা হইলে, তাহার ও তৎসংলগ্ন
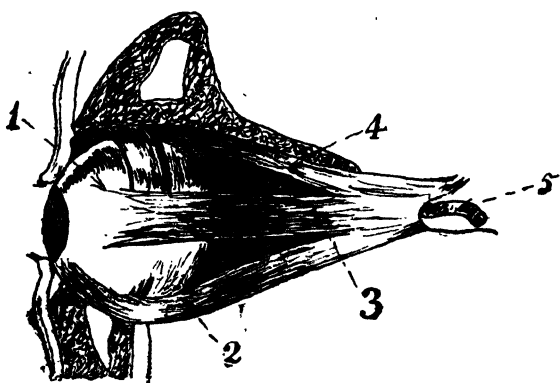
চিত্র ২৪—চক্ষু-গোলকের মাংস-পেশী

১—চক্ষু-গোলক। ২, ৩, ৪—চক্ষু-গোলকের মাংস-পেশী। ৫—চক্ষু-স্নায়ু।

মাংস-পেশীর উপর চাপ পড়ে। নিকটস্থ বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই চক্ষুর কাঁচ মোটা হয়। অতএব একসঙ্গে অধিকক্ষণ নিকটস্থ বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষুর কাঁচ ও তৎসংলগ্ন মাংস-পেশী ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে চক্ষুতে বেদনা বোধ হয় ও মাথা ধরে। পড়িবার বা লিখিবার সময় তোমাদিগকে নিকটস্থ বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। তজ্জন্য এক সময়ে অনেকক্ষণ লেখাপড়া করিলে চক্ষুতে ব্যথা বোধ হয় ও মাথা ধরে।

এখন একবার চতুর্ব্বিংশ চিত্রের দিকে দেখ। দেখিবে যে, চক্ষু-কোটরের পশ্চাদ্ভাগ হইতে ছয়টী মাংস-পেশী আসিয়া চক্ষু-গোলকের সহিত

সংলগ্ন হইয়াছে। এই মাংস-পেশীর সাহায্যে আমরা চক্ষুকে চারিদিকে ঘুরাইতে পারি।

যখন আমরা নিকটস্থ বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন চক্ষু-কাঁচ-সংলগ্ন মাংস-পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয়। সেইজন্য চক্ষু-কাঁচ মোটা হয়। এই মাংস-পেশীগুলি দুই দিকে চক্ষু-গোলকের সহিত সংলগ্ন। ইহারা সঙ্কুচিত হইলে চক্ষু-গোলকের উপরেও টান পড়ে। যে ছয়টী মাংস-পেশী দ্বারা আমরা চক্ষু চারিদিকে ঘুরাইয়া থাকি, নিকটস্থ বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তাহারা চক্ষু-গোলক দুইটীকে একটু নাসিকার দিকে টানিয়া লইয়া নিকটস্থ বস্তুর দিকে স্থাপিত করে। ক্রমাগত নিকটস্থ বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, এই দুই টানের জন্য চক্ষু-গোলক একটু লম্বা হইয়া যায়। ইহার ফল এই হয় যে, রেটিনা হইতে চক্ষুর কাঁচের ব্যবধান একটু বাড়িয়া যায়। এই ব্যবধান বাড়িয়া গেলে, দূরের বস্তুর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব রেটিনার সম্মুখে পড়ে, ঠিক্ রেটিনার উপরে পড়ে না,—রেটিনার উপর অস্পষ্ট ভাবে পড়ে। সুতরাং তখন দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখা যায় না।

যাহারা অত্যধিক লেখা পড়া, বা সেলাই, বা অন্যরূপ কোন কাজ করে—যাহাতে অনেকক্ষণ নিকটস্থ বস্তুর দিকে একদৃষ্টে দেখিতে হয়, তাহাদের দূরের জিনিষ দেখিবার শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যায়। তাহারা নিকটের জিনিষ স্পষ্ট দেখিতে পায় বটে কিন্তু দূরের জিনিষ অস্পষ্ট দেখে।

বাল্যকালে চক্ষু-গোলক অত্যন্ত নরম থাকে। অতএব বাল্যকালে নিকটস্থ বস্তুর দিকে এক সময়ে অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিলে, চক্ষু-গোলক একটু লম্বা হইয়া যাইবার অধিক সম্ভাবনা। অতএব তোমরা একসময়ে অধিকক্ষণ লেখা পড়া করিও না; এবং যখনি লেখা পড়া করিবে, তোমাদের চক্ষু হইতে বই অন্ততঃ ১২ ইঞ্চ দূরে রাখিবে।

তোমাদের পড়িবার সময় যথেষ্ট আলো থাকা আবশ্যক। যথেষ্ট আলো না থাকিলেও তুমি হয় ত তোমার চক্ষু বইএর অতি নিকটে লইয়া গিয়া পড়ার

কায চালাইয়া লইতে পার, কিন্তু ইহা বড় খারাপ অভ্যাস। ইহাতে চক্ষুর অনেক অনিষ্ট হয়, এইরূপ কখনও করিও না। যথেষ্ট আলো না থাকিলে পড়িবেই না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা বই কখনও পড়িও না। এইরূপ বই পড়িয়া এবং অল্প আলোতে বইএর অতি নিকটে চক্ষু লইয়া গিয়া পড়িয়া অনেকেরই চক্ষু নষ্ট হইয়াছে।

যে ঘরে,যথেষ্ট আলো আইসে না, সেই ঘরে বসিয়া পড়িলে চক্ষুর উপর জোর পড়ে। তজ্জন্য চক্ষুতে বেদনা বোধ হয়, মাথা ধরে; অবশেষে দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে।

তোমাদের পড়িবার ঘরে যথেষ্ট আলো থাকা চাই বলিলাম বলিয়া মনে করিও না যে, তথায় রৌদ্র আসা চাই। পড়িবার জন্য ঘরের মধ্যে সূর্য্যের আলোকেরই আবশ্যক, রৌদ্রের কোনই প্রয়োজন নাই। তীব্র আলোক চক্ষুর পক্ষে অনিষ্টকর।

পড়িবার সময় সম্মুখ দিয়া আলো আসা ভাল নয়, কারণ ইহাতে চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যায়। বেশীভাগ আলো বাম দিক হইতে আসিলেই ভাল। দক্ষিণ দিক হইতে যে আলো আইসে তাহাও মন্দ নয়, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে যে আলো আইসে তাহা অধ্যয়নের পক্ষে সুবিধাজনক নহে, কারণ ইহাতে সম্মুখে ছায়া পড়ে।

সূর্য্য, বিদ্যুৎ, বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতি তীব্র আলোকের দিকে কখনও চাহিয়া থাকিও না। অন্ধকার হইতে হঠাৎ আলোকে আসিও না। নিদ্রা হইতে উঠিয়াই আলোকে আসা উচিত নয়।

চক্ষুর ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি সবল ও অক্ষত থাকিলেও যদি চক্ষুর স্নায়ু অথবা রেটিনা কোন প্রকারে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। এরূপ হইলে বাহ্য-বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনার উপরে পড়িবে বটে, কিন্তু সে সংবাদ মস্তিষ্ককে কে দিবে?

বাহ্য-বস্তুর প্রতিবিম্ব চক্ষুর ভিতরে উল্টাভাবে পড়ে, কিন্তু আমরা

তাহা উল্টা দেখি না। কেন? উল্টা ছবি পড়িলে কি হয়, মস্তিষ্ক ঐ উল্টা ছবির সোজা (উল্টা ছবি হইলে সোজা, সোজা ছবি হইলে উল্টা, এইরূপ) অর্থ করিয়া লয়।

চক্ষুর ভিতরে যে গোল রঙ্গিন পর্দ্দা আছে বলিয়াছি, তাহা আমাদের কি উপকারে আইসে, জান? এই পর্দ্দা সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হইয়া তারাকে ছোট বা বড় করিতে পারে। এই পর্দ্দার সহিত কতকগুলি ছোট মাংস-পেশী সংলগ্ন আছে। উহার সঙ্কোচন বা প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই পর্দ্দা সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হইয়া তারাটীকে ছোট বা বড় করিয়া থাকে।

চক্ষুর মধ্যে অত্যধিক আলো গেলে আমরা কষ্ট বোধ করি। আকাশে তীব্র বিদ্যুতের দিকে তাকাইলে কি রকম বোধ হয়, জান ত? কোমল রেটিনার উপরে অধিক আলো পড়িলে রেটিনা ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তজ্জন্য তীব্র আলোকের নিকটে (যথা প্রখর রৌদ্রে) তোমার চক্ষুর পর্দ্দা সঙ্কুচিত হইয়া তারাটীকে ছোট করিয়া দেয়। সুতরাং অধিক আলো তোমার চক্ষুর ভিতরে যাইতে পারে না।

তোমার চক্ষুর তারা কিরূপে ক্রমশঃ বড় অথবা ছোট হয়, তাহা তুমি সহজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। একখানি দর্পণ লইয়া প্রথমে একটী অল্প আলোক-বিশিষ্ট ঘরে তোমার চক্ষুর তারাটীকে ভাল করিয়া লক্ষ্য কর, পরে বারাণ্ডায় আসিয়া দেখ, তারাটী পূর্ব্বাপেক্ষা ছোট হইয়াছে, তৎপরে মাঠে রৌদ্রের মধ্যে যাইয়া দেখ, উহা আরও অধিক ছোট হইয়া গিয়াছে। এইরূপে রৌদ্র হইতে বারাণ্ডায় এবং বারাণ্ডা হইতে গৃহে প্রবেশ করিয়া দর্পণের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্বটীর দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, তারাটী পর পর বড় হইতেছে।

প্রখর রৌদ্রে খানিকক্ষণ থাকিয়া, কোন অল্প-অন্ধকার ঘরে গেলে প্রথমে কিছুই ভাল করিয়া দেখিতে পাই না, অল্পক্ষণ পরে সবই স্পষ্ট দেখা যায়। এইরূপ হয় কেন? যখন রৌদ্রে থাকি, তখন তারা ছোট হয়।

সেই ছোট তারা লইয়া অল্প-অন্ধকার ঘরে আসিলে, চক্ষুর ভিতরে যথেষ্ট আলো যাইতে পারে না। সুতরাং আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই না। অল্পক্ষণ পরে যখন তারা ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়, তখন যথেষ্ট আলোক চক্ষুর ভিতরে যাইতে পারে। সেই সময় আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই।

বিড়ালের চক্ষুর তারার এইরূপ সঙ্কোচন ও প্রসারণ তোমরা হয় ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। দিবাভাগে বিড়ালের চক্ষুর তারা খুব ছোট থাকে, মাত্র একটী সূক্ষ্ম রেখার ন্যায়। কিন্তু রাত্রিতে বা অন্ধকারে সেই তারা গোল ও বড় হয়।

চক্ষু কিরূপ কোমল ও প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয় তাহা বোধ হয় তোমাদিগকে এখন আর বলিতে হইবে না। কোমল বলিয়াই উহার রক্ষার জন্য উহা সযত্নে অস্থিকোটর মধ্যে রক্ষিত। চক্ষুর উপর উঁচু হাড় আছে বলিয়া কপালের ঘাম গড়াইয়া চক্ষুর মধ্যে পড়িতে পারে না। তীক্ষ্ণ আলোকে চক্ষুর পাতা বন্ধ হইয়া যায়, ইহাতে সেই আলোক চক্ষুর ভিতর যাইতে পারে না। চক্ষুর পাতা চক্ষুকে ধুলারাশি, মশা, মাছি প্রভৃতি হইতেও রক্ষা করে, ইহাদিগকে চক্ষুর ভিতরে যাইতে দেয় না।

**কর্ণের গঠন**—এইবার তোমাদিগকে কর্ণের গঠন-সম্বন্ধে কিছু বলিব।

মাথার খুলির দুই পার্শ্বে যে হাড় আছে, কর্ণ তাহারই মধ্যে স্থাপিত। কর্ণের মধ্যে যে ছিদ্র আছে, তাহা প্রায় এক ইঞ্চ ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। এই ছিদ্রের ভিতরের দিকের মুখ এক পাতলা ও শক্ত চামড়া দ্বারা বন্ধ করা আছে। ঢাক বা ঢোলে যে প্রকার চামড়া থাকে, এই চামড়াও অনেকটা সেইরূপ। আমরা এই চামড়াকে কর্ণ-পট বলিব। কর্ণ-পটে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্ত-নালী আছে।

কর্ণ-পট এত পাতলা যে, কর্ণের উপরে সজোরে ঘুঁসি মারিলে বা কর্ণের ছিদ্র দিয়া কোন প্রকারে খোঁচা মারিলে, উহা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।

চিত্র ২৫—কর্ণ।

১—কর্ণের বাহিরের অংশ। ২—কর্ণের ছিদ্র। ৩—কর্ণ-পট। ৪, ৫, ৬—কর্ণের ভিতরের হাড়। ৭—কর্ণের ভিতরের বাঁকান হাড়ের নালী। ৮—কর্ণের স্নায়ু ও তাহার শাখা-প্রশাখা।

উহা ছিঁড়িয়া যাইলে আর সারিবার উপায় নাই। তখন মানুষ জন্মের মত বধির হইয়া যায়।

কর্ণপটের ভিতরের দিকে পরস্পর সংলগ্ন তিনখানি ছোট হাড় আছে। ( চিত্র ২৫ )। প্রথম হাড়খানি পটের মধ্যভাগে সংলগ্ন এবং তৃতীয় হাড়-খানি আর একখানি ছোট চামড়ার সহিত সংলগ্ন। এই ছোট চামড়া, খুরের মত বাঁকা কতকগুলি হাড়ের নালীর ছিদ্রকে বন্ধ করিয়া আছে। এই নালীগুলিতে জলের মত একপ্রকার তরল পদার্থ আছে।

কর্ণের স্নায়ু মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া, খুলির এক ছিদ্র দিয়া কর্ণের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার পর অনেক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া উক্ত হাড়ের নালীর মধ্যে ছড়াইয়া গিয়াছে।

কর্ণের ভিন্ন ভিন্ন ভাগের কথা বলিলাম। এখন ঐ সকল ভাগের কার্য্যের বিষয় বলিবার পূর্ব্বে শব্দ কি প্রকারে কর্ণে পৌঁছে, তাহা বলিব।

মনে কর, তোমার স্কুলের ঘণ্টা বাজিল। ঘণ্টায় কেহ আঘাত না করিলে ঘণ্টা বাজে না। ঘণ্টায় আঘাত করিবামাত্র তুমি ঘণ্টার শব্দ শুনিতে পাও। ঘণ্টায় আঘাত করিবার অব্যবহিত পরেই যদি তুমি অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া ঘণ্টাকে স্পর্শ কর, তাহা হইলে তুমি দেখিবে যে, উহা কাঁপিতেছে। যতক্ষণ ঘণ্টার কম্পন থাকে, ততক্ষণ শব্দ হইতে থাকে। কম্পন থামিলেই শব্দও থামিয়া যায়। যে যে পদার্থ হইতে শব্দ হয় তাহারই এরূপ কম্পন হয়। কথা বলিবার সময় তুমি নিজের শ্বাস-নালীতে হাত দিলে অনুভব করিতে পারিবে যে, তাহারও কম্পন হইতেছে।

যখনই শব্দ হয়, তখনই শব্দায়মান বস্তুর কম্পন নিকটস্থ বায়ুকে আঘাত করে। তখন সেই বায়ু তাহার নিকটস্থ বায়ুকে, আবার সেই বায়ু তাহার নিকটস্থ বায়ুকে আঘাত করে। এইরূপে সেই কম্পন অবশেষে তোমার কর্ণের নিকটস্থ বায়ুকে আঘাত করে।

শব্দায়মান বস্তু হইতে কম্পন উৎপন্ন হইয়া, তাহা কি প্রকারে বায়ুর উপরে ভাসিতে ভাসিতে দূরে চলিয়া যায়, তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারিবে।

কতকগুলি বই লইয়া তোমার টেবিলের উপর ৩।৪ ইঞ্চ অন্তর সোজা করিয়া একলাইনে সাজাও, যেমন ষড়্-বিংশ চিত্রে দেখান হইয়াছে।
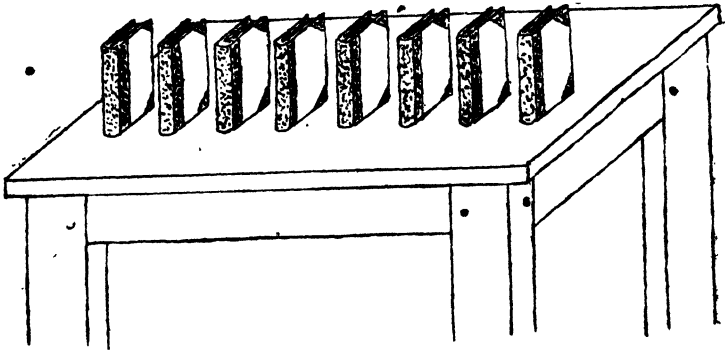
চিত্র—২৬।

বই সাজান হইলে, লাইনের প্রথম বইখানিকে একটু ধাক্কা দিয়া দ্বিতীয় বইএর উপর ফেলিয়া দাও। তাহা হইলে দেখিবে যে, দ্বিতীয় বইখানি তৃতীয় বইখানিকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিবে, তৃতীয় বইখানি চতুর্থ বইখানিকে, চতুর্থ বইখানি পঞ্চম বইখানিকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিবে। শেষে শেষ বইখানি ধাক্কা খাইয়া টেবিলের উপর পড়িয়া যাইবে।

শব্দায়মান বস্তু হইতে কম্পন উৎপন্ন হইয়া বায়ুকেও কতকটা এইরূপে আঘাত করে।

শব্দ-কম্পন তোমার কর্ণের নিকটস্থ বায়ুকে আঘাত করিলে, সেই বায়ু সেই কম্পন লইয়া কর্ণের ছিদ্রের মধ্যে যাইয়া, কর্ণপটের উপরে আঘাত

করে। তখন কর্ণ-পট (তোমার স্কুলের ঘণ্টার মত) কাঁপিতে থাকে। পটের কম্পনের জন্য পট-সংলগ্ন ছোট ছোট হাড়গুলিও কাঁপিতে থাকে। এই হাড়ের কম্পন সেই ছোট চামড়াকে কাঁপাইয়া তোলে। তখন হাড়ের নালীর মধ্যে যে তরল পদার্থ আছে, তাহাও কাঁপিয়া উঠে। সেই তরল পদার্থ কাঁপিলে, তাহার মধ্যে ভাসমান যে সকল কর্ণ-স্নায়ুর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখা আছে তাহারাও কাঁপিতে থাকে। সেই স্নায়ুসকল কম্পন অনুভব করিবামাত্র সেই সংবাদ মস্তিষ্কে লইয়া যায়। মস্তিষ্কে সেই সংবাদ পৌঁছিলে তুমি শব্দ শুনিতে পাও।

যদি এই স্নায়ুগুলি কোনপ্রকারে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহারা তরল পদার্থের কম্পন অনুভব করিতে পারিবে না; অতএব মস্তিষ্কে কোন সংবাদও লইয়া যাইতে পারিবে না। তাহা হইলে তোমার কর্ণের অন্যান্য ভাগ সুস্থ ও অক্ষত থাকিলেও, তুমি বধির হইয়া থাকিবে।

চক্ষুর মত কর্ণও বড় কোমল। যাহাতে কর্ণে সহজে কোন আঘাত না লাগিতে পারে সেইজন্য উহা খুলির হাড়ের মধ্যে কেমন লুক্কায়িত রহিয়াছে। চক্ষু ও কর্ণের বিশেষ যত্ন করিবে।

বালকবালিকাদের কাণ মলা, বা কাণের উপর চড় চাপড় বা কিল ঘুঁষা মারা কদাচ উচিত নহে। কাণে চড় মারিলে কাণ ও মস্তিষ্ক ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠে, খানিক ক্ষণ কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। কাণের উপর সজোরে চড় বা কিল মারিলে কর্ণপট ও তাহার পশ্চাদ্দিকের ছোট হাড় গুলিতে আঘাত লাগিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে মানুষ বধির হইয়া যায়।

কর্ণের ভিতর হইতে আঠা বা মোমের ন্যায় একপ্রকার রস বাহির হয়। এই রস কর্ণপটকে সিক্ত রাখে। ইহা শুকাইয়া গিয়া কাণের ময়লা বা খোল হয়। এইরূপ ময়লা সকলেরই কর্ণে এক-আধটু থাকে। কর্ণে ইহা অধিক জমিয়া গেলে আমরা কম শুনি। কারণ, এইরূপ

হইলে, শব্দ ময়লার দ্বারা বাধা পায় এবং কর্ণপটের নিকট পৌছিতে পারে না। কর্ণের ময়লাগুলি বাহির করিয়া দিলেই আবার আমরা বেশ শুনিতে পাই।

কর্ণের ময়লা বাহির করিবার জন্য, তোমরা হয় ত পেরেক, কলম, পেন্‌সিল বা অন্য কোন প্রকারের জিনিষ কর্ণের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া থাক। কিন্তু এ অভ্যাস ভাল নয়। ঘটনাক্রমে যদি কলম বা পেন্‌সিলের আঘাত লাগিয়া কর্ণপটে ছিদ্র হইয়া যায়, তাহা হইলে তুমি জন্মের মত বধির হইয়া যাইবে।

কর্ণপটে ছিদ্র হইলে কিছুতেই সারান যায় না, পৃথিবীর কোন ডাক্তারই উহা সারাইতে পারেন না। ডাক্তার ভিন্ন আর কাহাকেও তোমার কর্ণে কলম, পেন্সিল, পেরেক ইত্যাদি প্রবেশ করাইতে দিও না।

কর্ণের ময়লা বাহির করিবার এক সহজ উপায় তোমাদিগকে বলিতেছি। শুইতে যাইবার পূর্ব্বে তোমার দুই কর্ণের ভিতরে দুই চারি ফোঁটা তিল বা নারিকেল তৈল দিয়া, তূলা দ্বারা কর্ণ দুইটী বন্ধ করিয়া শয়ন করিবে। প্রাতে ঈষৎ গরম জলের পিচ্‌কারী দিবে। তাহা হইলে কর্ণের সমস্ত ময়লা আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসিবে—খোঁচাখুঁচির প্রয়োজন হইবে না।

কাণ-পাকা রোগ বালকবালিকাদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায়। কাণ পাকিলে কাণের ছিদ্রে পূঁয জমে। সেই পূঁয গড়াইয়া পড়িতে থাকে। কাণ পাকিলে কর্ণপটে ছিদ্র হইয়া যাইবার ও মস্তিষ্কে ফোড়া হইবার আশঙ্কা থাকে। কর্ণপটে ছিদ্র হইলে মানুষ বধির হইয়া যায়, মস্তিষ্কে ফোড়া হইলে তাহার আর বাঁচিবার আশা থাকে না; অতএব কাণ পাকিলে নিশ্চিন্ত না থাকিয়া অবিলম্বে ডাক্তারের সাহায্য লওয়া আবশ্যক।

---

# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

## খাদ্য-বিচার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, আহার দ্বারা আমাদের শরীরের ক্ষয়প্রাপ্ত মাংস-পেশী সকলের অভাব পূর্ণ হয় এবং পুষ্টিও হয়। ইহা ব্যতীত, খাদ্য আমাদের শরীরে বল ও উত্তাপ প্রদান করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, শরীরের মধ্যে যথেষ্ট তাপ আছে। তোমরা হয় ত ভাবিতে পার যে, এ তাপ অতি সামান্য। কিন্তু ইহা সামান্য নয়। এক কলসী জল গরম করিতে যতটা উত্তাপ আবশ্যক, ততটা উত্তাপ আমাদের শরীরে প্রত্যহ উৎপন্ন হইতেছে। খাদ্য হইতেই এই তাপ আইসে।

তোমাদিগকে ইহাও বলিয়াছি যে, রক্ত খাদ্য হইতে পুষ্টিকর সামগ্রী লইয়া শরীরের সর্ব্বত্র বিতরণ করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে। অতএব, তোমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, আমাদের খাদ্যে পুষ্টিকর সামগ্রী না থাকিলে শরীরের পুষ্টি হইবে না। এই কারণে আমাদের আহার্য্যের উপরে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আমাদের দেখা উচিত যে, আমরা যাহা আহার করি তাহাতে যথেষ্ট পুষ্টিকর সামগ্রী আছে কি না।

আমরা অনেক প্রকারের খাদ্য খাই। যথা—ভাত, ডাল, তরকারী, মিষ্ট দ্রব্য, মাছ, মাংস, তৈল, ঘী প্রভৃতি। এত প্রকার খাদ্য আমরা খাই কেন? কেবল একপ্রকার খাদ্য খাই না কেন? কেবল কি রসনা পরিতৃপ্তির

জন্যই আমরা নানাপ্রকার খাদ্য খাই ? না, তাহা নহে। ইহার কারণ আছে। কি কারণ, বলিতেছি শুন।

আচ্ছা, আমরা কি কি খাই, দেখা যাউক্। আমরা প্রধানতঃ (১) চাল, আলু, আটা, ময়দা, সুজী, চিনি প্রভৃতি (২) নানারকমের ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, খেজুর, বাদাম, আখরোট প্রভৃতি এবং (৩) মাখন, ঘী, দুধ, প্রভৃতি খাইয়া থাকি।

ইহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর খাদ্য সকল শরীরে তাপ ও কার্য্য করিবার শক্তি উৎপাদন করে। এই শ্রেণীর খাদ্য-সামগ্রী আমাদের অত্যন্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্য দ্বারা আমাদের ক্ষয়প্রাপ্ত মাংস-পেশীর অভাব পূরণ হয়। এই শ্রেণীর খাদ্যই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়; কারণ, ইহাই আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখে। এই খাদ্য না খাইলে আমাদের মাংস-পেশী-গুলি ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া শুকাইয়া যাইবে, অবশেষে আমরা মরিয়া যাইব।

তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্যগুলিও প্রথম শ্রেণীর খাদ্য-দ্রব্যের ন্যায়, শরীরে উত্তাপ উৎপাদন করে। কিন্তু এই শ্রেণীর খাদ্যগুলির এক বিশেষত্ব এই যে, ইহা চর্ব্বিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া শরীরে চামড়ার নীচে জমা থাকে। আমাদের স্নায়ু সকলের এই স্নেহপদার্থের বিশেষ প্রয়োজন।

এই তিন শ্রেণীর খাদ্য ব্যতীত আমরা শাক, সব্জী, ফল, মূলও খাইয়া থাকি। এই সকল পদার্থের সারাংশ অল্প হইলেও প্রধানতঃ অস্থি, মস্তিষ্ক এবং মাংস-পেশী প্রভৃতিরও গঠনে সহায়তা করে। শাকসব্জী খাইলে আমাদের আর এক উপকার হয়; ইহাতে আমাদের কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে। রক্ত খাদ্য হইতে শরীর-গঠনোপযোগী সামগ্রী চুষিয়া লইলে কতকটা দুষ্পাচ্য দ্রব্য পড়িয়া থাকে, তাহা মলের আকারে বাহির হইয়া যায়। অন্ত্র ইহাকে চাপ দিয়া বাহির করিয়া দেয়। মলের পরিমাণ অল্প হইলে অন্ত্র তাহাকে চাপ দিবার সুবিধা পায় না। শাকসব্জীর মধ্যে দুষ্পাচ্য বস্তু অধিক থাকে বলিয়া ইহার অধিকাংশ পরিপাক না হইয়া অন্ত্রে

থাকিয়া যায়। এইজন্য মলের পরিমাণ অধিক হওয়াতে মলকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিতে অন্ত্রের বিশেষ সুবিধা হয়।

অতএব যাহাদের সাধারণতঃ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না তাহাদের অধিক পরিমাণে ফল, মূল, শাকসব্জী খাওয়া উচিত; তাহা হইলে তাহাদের কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

এখন তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, কেন আমরা বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য খাইয়া থাকি। কোন খাদ্য আমাদিগকে প্রধানতঃ তাপ দেয়, কোন খাদ্য প্রধানতঃ ক্ষয়প্রাপ্ত মাংস-পেশীর অভাব পূর্ণ করে ও নূতন মাংস গঠন করে। আমাদের প্রত্যহই উক্ত চারি প্রকারের খাদ্য কিছু কিছু খাওয়া উচিত।

কিন্তু কোন্ খাদ্য কতটা খাওয়া উচিত? কোন্ শ্রেণীর খাদ্য অধিক খাওয়া উচিত? কোন্ শ্রেণীর খাদ্য অল্প খাওয়া উচিত?

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, আমাদের একভাগ দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য, এবং চারি হইতে পাঁচভাগ অন্যান্য শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য খাওয়া উচিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত, অন্যান্যশ্রেণীর খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর জিনিষ গুলি (অর্থাৎ চাল, গম প্রভৃতি) অধিক পরিমাণে খাওয়া উচিত; তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর খাদ্যগুলি অল্প পরিমাণে খাইলেই চলে।

বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্যের এক তালিকা পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। ইহা দেখিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে, কোন্ খাদ্যদ্রব্যের কি কি গুণ কি পরিমাণে আছে।

অনেকের বিশ্বাস যে, মাছ ও মাংস অতি উত্তম খাদ্যদ্রব্য, ইহা খাইলে শরীরে পুষ্টি ও বল হয়; এরূপ পুষ্টিকর ও বলকারক পদার্থ অন্য কোন খাদ্যদ্রব্যে নাই। পর পৃষ্ঠার তালিকা দেখিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, মাছ ও মাংস অপেক্ষা মটর, মসুর, ছোলা প্রভৃতি ডালে পুষ্টিকর পদার্থ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। মাংস অপেক্ষা মটর কিম্বা ছোলা অধিকতর পুষ্টিকর।

| খাদ্য-দ্রব্যের নাম | জলীয় অংশ | মাংস-নির্ম্মাণো-পযোগী পদার্থ | তাপ ও শক্তি-উৎপাদক পদার্থ | স্নেহ-পদার্থ | হাড়, দাঁত প্রভৃতি নির্মাণো-পযোগী পদার্থ |
|---|---|---|---|---|---|
| চাল | ১২ | ৬ | ৮০ | ১ | ১ |
| গম | ৩৭ | ৮ | ৫২ | ১ | ২ |
| মটর | ১৫ | ২৩ | ৫৮ | ২ | ২ |
| মসুর | ১২ | ২৭ | ৫৬ | ২ | ৩ |
| ছোলা | ১২ | ২১ | ৬২ | ৩ | ২ |
| সিম | ১০ | ২২ | ৬৩ | ২ | ৩ |
| আলু | ৭৫ | ২ | ২২ | ০ | ১ |
| মাছ | ৭৮ | ১৮ | ০ | ৩ | ১ |
| মাংস | ৭৩ | ১৯ | ০ | ৩ | ৫ |
| ডিম | ৭৪ | ১৪ | ০ | ১০ | ২ |
| দুধ | ৮৬ | ৪ | ৫ | ৪ | ১ |
| ঘী | ৬ | ১ | ০ | ৯১ | ২ |

উপরের তালিকায় ১০০ ভাগের হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

মাংস ভোজন সম্বন্ধে এক প্রধান আপত্তি এই। তোমাদিগকে পূর্ব্বের এক পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, প্রতিমুহূর্ত্তেই সকল জন্তুর দেহে দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে। সেই সকল দূষিত পদার্থকে রক্ত দূর করিতেছে। যে জন্তুর মাংস আমরা খাই, ( যথা পাঁঠা, মাছ ইত্যাদি ) তাহা কাটিলে তাহার রক্তের চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। অতএব দূষিত পদার্থ জন্তুর শরীর হইতে

দূর হইতে না পারিয়া রক্তের ও মাংস-পেশীর মধ্যেই থাকিয়া যায়। সেই দূষিত-পদার্থ-যুক্ত মাংস খাইলে নানাবিধ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

কোন জন্তুকে কাটিয়া ফেলিলেও কয়েক ঘণ্টাপর্য্যন্ত, অনেক স্থলে দুই এক দিন পর্য্যন্তও মাংস-পেশী সকল হইতে দূষিত পদার্থ বাহির হইতে থাকে। এই মাংস খাইলে, সেই দূষিত ও বিষাক্ত পদার্থও খাওয়া হয়। ইহাতে অনেক প্রকার রোগ জন্মিতে পারে। ইহা ব্যতীত যে জন্তুর মাংস খাও তাহার কোন রোগ থাকিলে, সেই মাংস খাইয়া তোমারও সেই রোগ হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

ডাক্তার হেন এবং ডাক্তার ফেল্‌গ্‌ বলেন যে, মাংস খাইলে নানা প্রকার রোগ জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা ; যথা,—গেঁটেবাত, বহুমূত্র, পাথুরী, হাবা, স্নায়ুশূল, শোথ, নানা প্রকার প্রস্রাবের ও যকৃতের পীড়া ইত্যাদি।

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার তালিকা হইতে দেখিতে পাইবে যে, দুধে তাপ-উৎপাদক, মাংস-নির্ম্মাণকারী পদার্থ প্রভৃতি সমস্তই বিদ্যমান। দুধ সকলের পক্ষেই উত্তম খাদ্য। শিশুদের ইহাই প্রধান খাদ্য। ইহাতে কার্য্য করিবার শক্তি-উৎপাদক পদার্থ অল্প আছে। কিন্তু শিশুদিগকে আহার নিদ্রা ব্যতীত আর কোন কার্য্যই করিতে হয় না, এইজন্য কেবল দুধই ইহাদের উপযুক্ত খাদ্য। কিন্তু শিশু বড় হইলে নানা প্রকার কার্য্য করে, দৌড়ায়, লাফায়, খেলা করে তখন কেবল দুধে তাহার পুষ্টি হয় না, শক্তি উৎপাদক খাদ্যও তখন তাহাকে খাইতে হয়।

যে ব্যক্তি যে প্রকার কার্য্য করে, তাহার তদনুরূপ খাদ্য খাওয়াও উচিত। যে সকল ব্যক্তিকে শারীরিক পরিশ্রম অধিক করিতে হয়, ( যেমন কুলী মজুর ) তাহাদিগের প্রথম শ্রেণীর খাদ্য ( চাল, গম, আলু, চিনি প্রভৃতি ) অধিক পরিমাণে খাওয়াই উচিত।

অনেকের ধারণা যে, মাছ ও মাংস খাইলে শারীরিক পরিশ্রম অধিক করা যায়। কিন্তু ইহা ভুল ধারণা। পূর্ব্ব পৃষ্ঠার তালিকা দেখিলেই বুঝিতে

পারিবে যে, মাছ ও মাংসে তাপ ও কার্য্যকারী শক্তি-উৎপাদক পদার্থ কিছুই নাই। অতএব যাহারা অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম করে, তাহাদের মাছ বা মাংস না খাইয়া ডাল খাওয়া উচিত; কারণ ডালে কার্য্যকারীশক্তি উৎপাদক এবং মাংস-নির্ম্মাণোপযোগী পদার্থ উভয়ই বর্ত্তমান আছে।

কিন্তু যাহাদের শারীরিক অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রম অধিক করিতে হয়, (যেমন ছাত্র, শিক্ষক, উকীল) তাহাদের সহজপাচ্য খাদ্য-দ্রব্য (যথা ভাত, দুধ, মাখন, সুসিদ্ধ মসুর বা মুগের ডাল, পাকা ফল প্রভৃতি) খাওয়া উচিত। এরূপ লোকের অধিক পরিমাণে শাকসব্জী, তরকারী প্রভৃতি খাওয়া উচিত নয়।

প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে আহার করা উচিত। আহার্য্য দ্রব্য উত্তমরূপে না চিবাইয়া গিলিবে না। একবারের খাদ্যদ্রব্য পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত পুনরায় আহার করিবে না। খাদ্য সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হইতে প্রায় তিন চারি ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হয়; সেইজন্য একবার আহারের পর অন্ততঃ তিন চারি ঘণ্টা সময় অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিতীয়বার আহার করা কখনও উচিত নহে। আহারের সময় জল পান করিবে না, অন্ততঃ আধ ঘণ্টা পরে জল পান করিবে। একবারে অধিক পরিমাণে আহার করা ভাল নয়। রাত্রিতে বিলম্ব না করিয়া একটু সকাল সকাল আহার করাই উচিত। যাহারা মানসিক পরিশ্রম অধিক করিয়া থাকে, তাহাদের দিনের বেলায় আহার লঘু হওয়া আবশ্যক।

---

# নবম পরিচ্ছেদ।

## ব্যায়াম।

তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মাংসপেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। তোমার ক্ষুদ্রতম অঙ্গুলিটী একটু নড়িলে, কিম্বা একটী কথা বলিলেও তোমার মাংস-পেশী একটু না একটু ক্ষয় হইয়াই যায়। এমন কি, চুপ করিয়া বসিয়া চিন্তা বা নিঃশব্দে পাঠ করিলেও শরীরের কিয়দংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। চিন্তা করিলে মস্তিষ্কের কিয়দংশ ক্ষয় হইয়া যায়।

আমরা অনবরত কোন না কোন কার্য্য করিতেছি। অতএব আমাদের মাংস ক্রমাগত ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। এই ক্ষয়প্রাপ্ত মাংস শরীরের কোন কার্য্যে লাগে না, বরং শরীরে থাকিলে অনিষ্ট হয়। উহা রক্তের সহিত মিশিতেছে। রক্ত উহাকে ফুসফুসে লইয়া যাইয়া নিশ্বাস-বায়ুর সহিত দূষিত বায়ুরূপে শরীর হইতে বাহির করিয়া দিতেছে।

তোমাদিগকে ইহাও বলিয়াছি যে, রক্ত খাদ্য হইতে শরীর-গঠনোপযোগী সামগ্রী লইয়া উহা শরীরের সর্ব্বত্র বিতরণ করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত মাংসের অভাব পূরণ এবং নূতন মাংস গঠন করিতেছে।

অতএব তোমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, রক্তের উপযুক্ত সঞ্চলনের উপর শরীরের আবর্জ্জনা বহিষ্করণ এবং নূতন মাংসের গঠন (অর্থাৎ শরীরের পুষ্টি) নির্ভর করিতেছে। রক্তের যথোপযুক্ত সঞ্চলন না হইলে শরীরের আবর্জ্জনা দূর হয় না, শরীরের পুষ্টিও হয় না। যদি এক মিনিটের জন্তও রক্তের সঞ্চলন বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত রক্ত আবর্জ্জনাপূর্ণ

হইয়া যায়—ফলে মানুষ মরিয়া যায়। অতএব, রক্তের সঞ্চলন কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা তোমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছ। তোমরা সম্ভবতঃ ইহাও বুঝিতে পারিতেছ যে, কোন প্রকারে রক্তের সঞ্চলন দ্রুত করিতে পারিলে শরীরের অনেক উপকার হয়।

ব্যায়াম করিলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত হয় সুতরাং রক্তের সঞ্চলনও দ্রুত হয়। রক্তের দ্রুত সঞ্চলন হইলে শরীরের সর্ব্বত্র অধিক পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হয়। সুতরাং শরীরের মধ্যে আবর্জ্জনা উৎপন্ন হইতে না হইতেই, রক্ত তাহা বাহির করিয়া দেয়। রক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত মাংস-পেশী সকলের অভাব পূর্ণ ত করেই, তদ্ভিন্ন আরও কিছু অধিক পুষ্টিকর সামগ্রী তাহাদিগকে দিতে পারে। ইহাতে শরীরের পুষ্টি হয়। অতএব, তোমরা যদি সুস্থ, সবল ও হৃষ্টপুষ্ট হইতে চাও, তাহা হইলে প্রত্যহ নিশ্চয় কোন না কোন প্রকার ব্যায়াম করিবে।

ব্যায়াম করিলেও শরীরের ক্ষয় হয় বটে, কিন্তু ক্ষয় অপেক্ষা পুষ্টি অধিক হয়, এবং ব্যায়ামে যতটুকু আবর্জ্জনা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে অনেক অধিক আবর্জ্জনা বহিষ্কৃত হয়।

ব্যায়াম কালে শরীর হইতে অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়। এই ঘর্ম্মের সহিত রক্তের আবর্জ্জনা অনেকটা বাহির হইয়া যায়। ব্যায়ামের সময় নিশ্বাসও দ্রুত এবং দীর্ঘ হয়। সেইজন্য শরীর হইতে অধিক পরিমাণে দূষিত বায়ু (আবর্জ্জনা) বাহির হইয়া যায়; এবং অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু ফুসফুসে যাইয়া রক্তকে শীঘ্র শীঘ্র পরিষ্কার করিয়া দেয়। বিশ্রাম-কালে এত অধিক বিশুদ্ধ বায়ু ফুসফুসে যায় না, রক্তও এত তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয় না। রক্তের সঞ্চলন দ্রুত হওয়ার জন্য, এই পরিষ্কৃত বিশুদ্ধ রক্ত শীঘ্র শীঘ্র শরীরের সর্ব্বত্র যাইতে পারে। অতএব শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত মাংসের অভাব পূরণ করিয়া দিয়া শীঘ্র শীঘ্র নূতন মাংসের সৃষ্টি করিতে পারে।

এইসকল কারণে ব্যায়াম দ্বারা শরীর সুস্থ, সবল, পরিপুষ্ট, দৃঢ় ও কার্য্যক্ষম হয়। যে ব্যক্তি প্রত্যহ রীতিমত ব্যায়াম করে, সহসা তাহার কোন পীড়া হয় না; তাহার শরীর সুশ্রী হয়, তাহার মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, সে অধিক কার্য্য করিতে ও অধিক কষ্ট সহ্য করিতে পারে।

ব্যায়াম করিলে অনেক রোগের উপশম হয়। ব্যায়াম, ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, শরীরের শিথিলতা ও স্থূলতা নাশ করিয়া দেহকে সুন্দর করিয়া দেয়। ব্যায়ামশীল ব্যক্তি বলবান্, সাহসী, সহিষ্ণু, আত্ম-নির্ভরশীল ও সংযমী হয়। ব্যায়ামের অশেষ গুণ। তোমরা প্রত্যহ নিশ্চয় ব্যায়াম করিবে। ব্যায়ামে কখনও অবহেলা করিবে না।

আমাদের দেশে অনেকের ধারণা আছে যে, ব্যায়াম করিলে বুদ্ধি হ্রাস হয়। ইহা নিতান্ত অসত্য কথা, নির্ব্বোধের কথা। ব্যায়াম করিলে বুদ্ধি বাড়ে, কখনই কমে না।

প্রায় সকলেরই ব্যায়াম করা উচিত। বালিকাদেরও ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। শিশু, বৃদ্ধ বা পীড়িত ব্যক্তিদের ব্যায়াম করা উচিত নয়।

অত্যধিক ব্যায়াম অনিষ্টকর। আমার বয়স ৩০ বৎসর, তোমার বয়স ১৩।১৪ বৎসর। আমার পক্ষে ১ ঘণ্টা ব্যায়াম যথেষ্ট, কিন্তু তোমার পক্ষে উহা অত্যধিক হইবে। ব্যায়াম করিয়া অবসাদ বোধ করিলে জানিবে যে, অত্যধিক ব্যায়াম হইয়া গিয়াছে। তোমার পক্ষে কতটুকু ব্যায়াম উপযুক্ত তাহা তোমার পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা তোমার শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিয়া লইও।

ব্যায়াম নিয়মিতরূপে করা কর্ত্তব্য। একদিন ব্যায়াম করিয়া পাঁচ দিন করিলে না, আবার একদিন করিলে, আবার তিনদিন করিলে না, এইরূপ ব্যায়ামে বিশেষ লাভ নাই। ব্যায়াম প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে করা উচিত।

বৈকাল বেলাই ব্যায়ামের প্রশস্ত সময়। ব্যায়ামের মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করিতে হয়, প্রথমেই অধিক করিতে নাই। মনে কর, তুমি প্রথম দিনে

পাঁচ পাঁচটী করিয়া তিনবারে ১৫ পনেরটী ডন্ করিলে। পাঁচ ছয় দিন ঐরূপে পনেরটী ডন করিবে। সপ্তম দিনে আরও পাঁচটী করিতে পার। ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ দিন হইতে ২৫টী ডন করিতে পার। চতুর্দ্দশ দিনে ২৫টী ডন্ করিয়া যদি ক্লান্তি বোধ কর তাহা হইলে অমনি কমাইয়া দিবে—২০টাই করিবে।

যে ব্যায়াম করিতে তোমার ভাল লাগে, তাহাই করিবে। পদব্রজে ভ্রমণ, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, দৌড়ান, দেশীয় ডন্, বৈঠকী, বিলাতী জিম্‌নাষ্টিক্‌স্, ডাম্-বেল, হকি, ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলা—ইহার মধ্যে সবগুলিই ভাল ব্যায়াম।

যে ব্যায়ামে শরীরের প্রায় সমস্ত মাংস-পেশীরই সঞ্চালন হয়, সেই ব্যায়াম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সন্তরণে হাত পা প্রভৃতি অনেকগুলি অঙ্গের সঞ্চালন হয়। সন্তরণ একটী উত্তম ব্যায়াম। পদব্রজে ভ্রমণে প্রধানতঃ পায়ের পেশীরই ব্যায়াম হয়। কেবল এক-প্রকার ব্যায়াম না করিয়া দুই তিনটী ব্যায়াম করিলে ভাল হয়। একাকী ব্যায়াম না করিয়া দুই চারি জন মিলিয়া করিলে তোমাদের বিশেষ কষ্ট বোধ হইবে না।

মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম করিবে। তাহা না করিলে ব্যায়াম করিয়া তত উপকার পাইবে না। ঘরের মধ্যে যদি ব্যায়াম কর, তাহা হইলে দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া করিবে। উঁচু খোলা ছাদে যাইয়াও ব্যায়াম করিতে পার।

খালি-পেটে ব্যায়াম করিতে নাই। ব্যায়াম-কালে রক্ত, খাদ্য হইতে পুষ্টিকর সামগ্রী লইয়া নূতন মাংস গঠন করিবে ত! কিন্তু তোমার পেটে খাদ্যই যদি না থাকে, তবে রক্ত পুষ্টিকর সামগ্রী কোথায় পাইবে? অতএব খালি-পেটে ব্যায়াম করিলে শরীরের পুষ্টি হওয়া দূরের কথা বরং আরও ক্ষয় হইবে।

পেট ভরিয়া খাইয়াও ব্যায়াম করিবে না। পেট ভরা থাকিলে খাদ্যের

পরিপাকের জন্য পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে অনেকটা রক্তের প্রয়োজন হয়। ভরা-পেটে ব্যায়াম করিলে রক্তের দ্রুত সঞ্চলন হেতু রক্ত অধিক পরিমাণে পাকস্থলী ও অন্ত্রের রক্ত-নালী সমূহে প্রবাহিত হইতে পারে না; ব্যায়াম-কালে যে সকল অঙ্গের অধিক চালনা হয়, সেই সকল অঙ্গেই অধিক রক্ত প্রবাহিত হয়। এইজন্য পরিপাকের ব্যাঘাত হয়।

———